সাফল্য

– মোহাম্মদ বজলার রহমান

১৯৭৭ সাল। আমি তখন এইচএসসি সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। আমার বাবার আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। খুব কষ্ট করে কলেজে পড়তাম। কিন্তু ভালো ছাত্র ছিলাম বরাবর। আর একটা ভালো গুণ এ সময় যোগ হলো আমার মাঝে। হঠাৎ করে ভালো প্রেমিক হয়ে গেলাম। আমার এক মামাতো বোনের প্রেমে পড়ে গেলাম এবং দুই পক্ষের মুরুব্বিদের সম্মতিতে আমাদের বিয়েও হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি। বিয়ের পর কয়েক মাস খুব ভালোভাবেই কাটলো। প্রেম করে বিয়ে তো! মনের মাঝে সব সময় একটা অসম্ভব ভালোলাগা। সদ্য বিবাহিতা প্রেমিকা স্ত্রীকে চোখে চোখে রাখতেই বেশি ভালো লাগতো। ছয় মাস পার হতে না হতেই আমাদের সম্পর্কের অবনতি হতে শুরু হলো। আমার বেকার জীবন এবং বাবার আর্থিক অসচ্ছলতা আমাদের মাঝে গভীর ভালোবাসাকে আস্তে করে গ্রাস করতে থাকলো। আমাদের মাঝে বাড়তে থাকলো দূরত্ব।

কথায় কথায় আমার প্রেমিকা বৌ বলতো, শাড়ি দিতে পারো না, গয়না দিতে পারো না আবার বৌ করার শখ।

দারিদ্র দরজায় এসে দাড়ালে ভালোবাসা জানালা দিয়ে পালায়। এখানে বলে রাখা দরকার, আমি ছোট থেকেই বড্ড আত্মসচেতন। আত্মসম্মান বোধ খুব বেশি আমার। সামান্য কারণেই মনে খুব কষ্ট পাই। কিন্তু কি করবো, সামর্থ তো নেই। আবার বিয়েও করে ফেলেছি আমার চেয়ে সচ্ছল পরিবারের মেয়েকে।

আমার কষ্টের কথা বুঝতে পেরে আমার বাবা তার একখণ্ড জমি বিক্রি টাকা দিয়ে একখানা শাড়ি কিনে আনলেন আমার স্ত্রীর জন্য। আমার খুব পছন্দ হয়েছিল শাড়িখানা। কিন্তু কম দামি বলে পছন্দ হয়নি আমার স্ত্রীর। নানান রকম কথা তো বললোই, শাড়িখানা পরেও দেখলো না একবার। খুব কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন। তবে কিছুই করতে পারিনি। আমি এক অথর্ব, অপদার্থ বেকার প্রেমিক স্বামী। এরপর একটা শাড়ির কারণে আমাদের মাঝে সম্পর্কের চরম অবনতি হতে শুরু হলো।

শেষ পর্যন্ত আমাকে পুরুষত্বহীন, অত্যাচারী, নেশাখোর হিসেবে বর্ণনা করে কোর্টের মাধ্যমে ডিভোর্স দিয়ে দিল বিয়ের মাত্র এক বছর পর ১৯৭৮ সালে। এবং মাত্র তিন মাস পর অন্য একটা ছেলেকে বিয়ে করে ফেললো।

বিয়ের প্রতি এবং মেয়েদের প্রতি চরম অনীহা থাকা সত্ত্বেও বাবা–মায়ের একান্ত অনুরোধে ১৯৮৫ সালে আবার বিয়ে করেছি তাদের পছন্দ করা এক মেয়েকে। ইতিমধ্যে বিএ পাস করেছি এবং একটা সরকারি চাকরি করছি ১৯৮০ সাল থেকে।

সৃষ্টিকর্তা আমাকে আজ সামর্থ দিয়েছে আমার স্ত্রীকে তার পছন্দের শাড়ি কিনে দেয়ার। কিন্তু আমার স্ত্রী কোনোদিনই দামি শাড়ি চায়নি। বলেনি আমি অত্যাচারী অথবা পুরুষত্বহীন, অথর্ব। ছেলেমেয়েসহ সবার কাছেই আমি ব্যক্তিত্ববান আদর্শ পুরুষ, শ্রদ্ধেয়, সৎ মানুষ।

একটা দামি শাড়ি না পাওয়ার জন্য যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্ত্রীলোক আমার ডিভোর্স চেয়েছিল অন্যায়, অন্যায্য মিথ্যা কথা বলে তার স্বামীর সংসারে আজো দামি শাড়ি কেনার সামর্থ হয়নি সচ্ছল

পরিবারের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও। অথচ ওই শাড়ি আমার জীবনের সাফল্যের সিড়ি তৈরি করে দিয়েছে। একটা শাড়ি আমাকে করেছে একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্ত্রীলোকের রাহুমুক্ত। সূচনা করেছে সাফল্যের, দান করেছে নতুন জীবন এবং পেয়েছি একজন প্রেমিকা নারীকে আদর্শ স্ত্রী হিসেবে। আমি এখন সুখী।

পোরশা, নওগা থেকে

প্রধানমন্ত্রীর শাড়ি

– সুলেখা

যাযাদির শাড়ি বিষয়ক লেখার কথা জেনে কেন জানি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কথা প্রথমে মনে হলো। এবারের নির্বাচনের আগে টিভি দেখে প্রথমে বাসার সবাই অবশ্যই মেয়েরা খেয়াল করতাম খালেদা জিয়া আজ কোন কালারের শাড়ি পড়েছেন। একই ধরনের শাড়ির এতো সুন্দর সুন্দর রঙ তিনি কোন দেশ থেকে আনেন। এ নিয়ে চলতো আমাদের তর্ক।

সবচেয়ে মজা পেয়েছিলাম নির্বাচনের দিন হাসিনার অদ্ভুত *নৌকা মার্কা* শাড়ি দেখে। বিপরীতে প্রশংসা করেছিলাম খালেদা জিয়ার সুন্দর রুচির। আমার মনে হয় খুব কম মহিলাই আছেন যারা প্রধানমন্ত্রীর শাড়ি দেখে দীর্ঘশ্বাস না ফেলেন। আমার আপা ছিলেন বিএনপির অন্ধভক্ত। ওনাকে প্রায়ই মজা করে বলতাম, আপনি খালেদা জিয়াকে মোবাইল ফোনে জিজ্ঞাসা করবেন শাড়ি কোন দেশ থেকে আনান। আমার মনে হয় যাযাদির পাঠকদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর শাড়ি নিয়ে একটু হলেও লেখা উচিত।

কিশোরগঞ্জ থেকে

দাদি

– মাকসুদা

ছোটবেলা থেকেই কারো নতুন শাড়ি পরা আমার প্রিয় শখ। অর্থাৎ ঘরে কোনো শাড়ি কিনলে প্রথমেই তা পরতাম। আমার দাদি শাড়ি কিনতে খুবই পছন্দ করেন। অর্থাৎ প্রতি মাসে তিনি যদি একটি করে শাড়ি কিনতে পারেন তাহলে যেন আর কিছুই তার দরকার নেই।

১৯৮৭ সালের ঘটনা। তখন আমার বয়স মাত্র ছয় বছর। সে বছর ঈদে বাবাকে আমার জন্য একটি শাড়ি কিনতে বললাম। কিন্তু আমার জন্য একটি জামা এবং দাদির জন্য খুব সুন্দর একটি শাড়ি কিনলেন বাবা। ঈদের মাত্র দুইদিন আগে বাবা আমাদের সবাইকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি গেলেন ঈদের আনন্দ করতে। ঈদের দিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে বাবাকে সালাম করলাম। তিনি আমাদের একটি করে এক টাকার চকচকে নোট হাতে দিলেন। এবং আমাদের সাবইকে খুব সুন্দর করে গোসল করিয়ে দিলেন। তারপর তিনি ঈদগাহে নামাজ পড়তে গেলেন। আমার দাদির কাছ থেকে শাড়িটি চেয়ে নিয়ে আমি খুব সুন্দর করে পরে নিলাম। এবং কিছু খাবার খেয়ে সেজভাইয়াকে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে যাবো বলে বের হয়েছি। যেই রাস্তায় এসেছি অমনি এক লোক সাইকেলসহ পড়লো

আমার পাশে। সাইকেলে জড়িয়ে আমার শাড়ির কিছু অংশ ছিড়ে গেল। এতো আনন্দের মুহূর্তে শাড়িটি ছিড়ে যাওয়ায় কষ্ট ও ভয়ে কাদতে শুরু করলাম। সেদিন আর কোথাও বেড়াতে যাওয়া হলো না।

শাড়িটি যেহেতু দাদির খুবই পছন্দ হয়েছে তাই শাড়িটি ছিড়ে যাওয়ায় সে খুব মন খারাপ করলো। তার মনের অবস্থা দেখে বাবা বললেন, মা তুমি মন খারাপ করো না। তোমার জন্য জুন মাসের শেষের দিকে শাড়ি নিয়ে আসবো। ঈদের কয়েক দিন পর আমরা বরিশাল চলে এলাম। ২৩ জুন বাবাকে বললাম দাদির জন্য একটি শাড়ি কিনতে এবং বাড়ি গিয়ে দাদিকে বরিশাল নিয়ে আসতে।

বাবা বললেন, ২৫ জুন বৃহস্পতিবার অফিস করে শাড়ি কিনে বাড়ি যাবেন এবং দাদিকে নিয়ে আসবেন। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস! ২৫ জুন সকালে তিনি অফিসের দরজায় ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়ে অফিসেই মৃত্যুবরণ করেন। ২৫ জুন তার আর শাড়ি কেনা হয়নি। তবে বাড়ি যাওয়া হয়েছে মৃত অবস্থায়।

বাবার মৃত্যুর পর তার কিনে দেয়া শেষ শাড়িটি দাদি স্মৃতি হিসেবে রাখতে চেয়েছেন যতোদিন তিনি বাচবেন ততোদিন। তাই তিনি শাড়িটি খুব যত্ন সহকারে তার স্পেশাল সুটকেসে রেখে দিলেন। এক বছর পর বাবার মৃত্যুদিনে তিনি সেই শাড়িটি পরে নামাজ পড়ে তার জন্য দোয়া করবেন বলে সুটকেসটি খুললেন। কিন্তু সুটকেট খুলে তিনি খুবই অবাক হলেন, দেখলেন সেখানে কোনো শাড়ি নেই। আছে কিছু টুকরো কাপড় অর্থাৎ ইদুরে শাড়িটি কেটে টুকরো টুকরো করেছে। বাবার সঙ্গে তার দেয়া শাড়িটি নষ্ট হয়ে গেল। তিনি হাউমাউ করে কাদতে লাগলেন।

এখন আমরা দাদিকে প্রতি বছর ঈদে তিনটি করে শাড়ি কিনে দিই। তারপরেও তিনি আর খুশি হতে পারেন না। ঈদের দিন তার হাতে আমরা শাড়ি তুলে দিলে তিনি কাদেন আর বলেন, এই শাড়ির সঙ্গে আমার ছেলের স্মৃতি জড়িত, কিভাবে আমি ঈদের দিন শাড়ি পরবো।

নিউ সার্কুলার রোড, বরিশাল থেকে

কাথা

– হারুন মাহমুদ

জন্মের পর তিন পরিবার থেকে তিন রকম স্বাদের ভালোবাসা পাওয়া যায়।

প্রথমত. মা-বাবার পরিবার। তারপর দাদা-দাদি ও নানা-নানির পরিবার। দুই পরিবার এক সঙ্গে বলছি। কারণ কারো কাছে দ্বিতীয়ত. দাদা-দাদি, কারো কাছে নানা-নানির পরিবার। মনে হয়, যে পরিবারের সঙ্গ বেশি পাওয়া যায় সেখানকার ভালোবাসা, আদর কিংবা স্নেহটুকু একঘেয়েমি লাগে বলেই হয়তো এই তারতম্য। আর এক পরিবারের ভালোবাসা, আদর পাওয়া যায়, তবে একটা নির্দিষ্ট সময়ে।

জন্মের আগেই সৃষ্টিকর্তা নানা-নানিকে স্বর্গবাসী করেছেন। সেই পরিবারের ভালোবাসা, আদরের অভিজ্ঞতা নেই। অন্যের দেখে কিছুটা হিংসা কিংবা কষ্ট হয় না তা বলছি না।

বড় মামা একটু অন্য রকম গোড়া। শতকরা একশ ভাগ গোড়া। দুই খালা। আট দশ কিলোমিটারের মধ্যে বাড়ি। তারপর নিজ নিজ সংসার নিয়ে ব্যস্ত।

আর আছেন ছোট মামা। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখছি ঢাকায় সেটেলড। মামা সরকারি একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন। এখন রিটায়ার্ড লাইফ কাটাচ্ছেন।

জমিজমা ভাগ-বণ্টন নিয়ে বড় মামার সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় সব কিছু বিক্রি করে ঢাকায় বাড়ি বানিয়েছেন। দুই ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ে বর্তমানে আমেরিকায়। জ্ঞান হওয়ার পর একবার দেখেছি। কেউ মারা গেলে দেখা যায় এদেরকে নবাবগঞ্জে। ছোট খালু মারা যাওয়ার সময় দেশে ছিল। সেই সৌভাগ্যে ছোট মামার একমাত্র মেয়েকে দেখার সুযোগ হয়েছিল।

বাপ্পী আর বাবু দুই মামাতো ভাই। বিয়ে করেছেন। দুটি বৌ বাড়িতে। বাবা এখনো জীবিত বলে কাজের কোনো চিন্তা করতে হয় না তাদের। মামা ডাবল ফ্ল্যাটের চার তলা বাড়ি বানিয়েছেন। যেন তাদের (মামাদের) মতো দুই ভায়ে মনোমালিন্য না হয়। জানি না কে উত্তর ফ্ল্যাট, কে দক্ষিণ ফ্ল্যাট এই নিয়ে আবার...!

আব্বা-আম্মা পরকালে স্বর্গবাসী হয়েছেন। আমি তখন ছোট। আম্মার কথা একটু একটু, আব্বা তো মনেই পড়ে না। আব্বা ডাকটাও অপরিচিত লাগে।

এখন বড় হয়েছি। ভাবলাম বেশ কয়েকবার ঢাকায় গেলাম। এবার ছোট মামার বাড়িটা খুজে বের করবোই, ঠিকানা তো আছে। আর গেলে হয়তো মামা-মামি খুশিই হবেন।

চাকরির ইন্টারভিউ দিতে ঢাকা গেলাম। শুনেছি ছোট মামা নবাবগঞ্জের মিষ্টি পছন্দ করেন। তাই নবাব মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে দুই রকমের মিলিয়ে তিন কেজি মিষ্টি কিনেছিলাম। বাড়ি খুজে পেতে কষ্ট হয়নি। পশ্চিম কাফরুলে।

মামা-মামির চেহারায় বয়সের ছাপ। মামিকে এই প্রথম দেখলাম। যা বর্ণনায় শুনেছিলাম তার সবই বিপরীত। মামার সম্পর্কের কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে নাকি ভালো আচরণ করেন না মামি। কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবে সাদরে গ্রহণ করলেন আমাকে আর আমার মিষ্টিকে। অনেক কথা, আব্বা কেমন ছিলেন। আম্মা কেমন ভালোবাসতেন ছোট ভাবীকে। আরো কতো কথা।

অসুখের কারণে বেশি দুর্বল হয়েছেন মামি। এটা দেখেই বোঝা যায়। ভাবলাম, মৃত্যুদূত হয়তো বাড়ির আশপাশে ঘোরাঘুরি করে বলেই মামির এ রকম আচরণ।

ইন্টারভিউ দিলাম, বাড়ি যাওয়ার দিন-ক্ষণও ঠিক করে ফেললাম। মামিকে বলতেই তিনি বললেন, যাওয়ার সময় কয়টা শাড়ি নিয়ে যাবি।

বের হওয়ার আগ মুহূর্তে মামি ব্যাগ নিয়ে বসলেন, সামনে কয়েকখানা শাড়ি। আমার পাশে বসা মামা।

এটা তোর বড় খালাকে দিবি। শ্যামলা রঙয়ের। তাই ঘিয়ে রঙয়ের শাড়িটা ভালো লাগবে। আর এটা তোর ছোট খালাকে দিবি। বললেন মামি। তিনি বলছেন এবং ভাজ করে ব্যাগের পেটটা ভর্তি করছেন।

শাড়িগুলো শরীর আর প্রকৃতির যুদ্ধে রঙ, জৌলুস হারিয়ে ফেলেছে। আমার মাথায় ঝড় বইছে। মামি এসব পুরনো শাড়িগুলো কেমন করে দিচ্ছেন। এরা মানুষকে এতোই ছোট করে দেখে?

এই শাড়ির ভেতরে কিছু পুরনো কাপড় দিয়ে শীতে গায়ে দেয়ার মতো একটা কাথা বানাতে বলবি মুকুলের বৌকে (বড় ভাবী)। মজুরি এবং সুতার দাম দিয়ে দিচ্ছি। মামির এ কথায় আরো স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

মামা বললেন, হারুন, তোর মামি জীবনে এতো কাপড় কিনেছে। যেটা পছন্দ হয় সেটাই কিনে ওয়ারড্রোব ভর্তি করে। এই যে কাথা বানানোর শাড়িটা এটা কোনোদিন তোর মামি পরেও দেখেনি।

আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে যেন এটা মানুষের জগৎ নয়। কোনোভাবে নিজেকে সামলে বেরিয়ে এলাম। দীর্ঘশ্বাস নেয়ার চেষ্টা করলাম। প্রকৃতির নির্মলতা নেই বাতাসে। শহুরে বাতাস, আশটে গন্ধ।

বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যায়নি সেই শাড়ির ব্যাগ, কাথা বানানো শাড়ি। চলন্ত বাসের জানালা দিয়ে ফেলে দিয়েছি। তার চেয়ে ভালো শাড়ি এখন খালা, ভাবীরা পরে। কিন্তু সেই দিন কষ্টটা যে দাগ কেটেছে হৃদয়ে তা আজো চলন্ত মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি।

বাগানাপাড়া, চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে

রূপান্তরিত

– আনাম

হিথরো এয়ারপোর্ট, লন্ডন। চাচা ও চাচাতো ভাইয়েরা এসেছিলেন রিসিভ করতে। চাচার স্পন্সরে স্টুডেন্ট ভিসায় এসেছি ইংল্যান্ডে। আসলেই দেশটি যে এতে সুন্দর তা দেখার পরই বিশ্বাস হয়েছে। কলেজে প্রথম দিন নিজেকে খুবই অসহায় মনে হয়েছিল। কারণ প্রথমত. অন্য কালচার আবার দ্বিতীয়ত. সবাই অপরিচিত। দেশে স্পোকেন ইংলিশ কোর্স করে গিয়েছিলাম। তাই কিছুটা রক্ষা পেলাম ক্লাসে টিচারদের লেকচার না বোঝা থেকে। এভাবে কলেজে তৃতীয় দিন আমাদেরই ক্লাসের একটি মেয়ে যে প্রথম দেখাতেই আমার মাথা ঘুরিয়ে দেয়। মেয়েরা যে এতো সুন্দর হতে পারে তাকে দেখার পরই আমার বিশ্বাস হলো। তারপর থেকে প্রায়ই তাকে লক্ষ্য করতাম এবং মাঝে মধ্যে তার সঙ্গে চোখাচোখিও হতো। আমার এভাবে তাকিয়ে থাকা প্রথমে হয়তো সে স্বাভাবিক মনে করেছিল। পরে বুঝতে পারলো ক্লাসের প্রায় সারাক্ষণ তার দিকেই যে তাকিয়ে থাকি। এভাবেই আমাদের তাকাতাকি চলতে থাকলো। তার কোনো ছেলে বন্ধু না থাকায় তাকে আরো বেশি ভালো লাগতো।

প্রায় মাস খানেক পর টিফিন আওয়ারে ক্যান্টিনে বসে বার্গার খাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম সেই মেয়েটি আমার টেবিলের দিকে হেটে আসছে। সেদিন সে পরেছিল কালো রঙয়ের একটি লং স্কার্ট। দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনো পরী বাতাসে উড়ে আসছে। আমি খাওয়া বন্ধ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

সে আমার সামনে এসে বললো, মে আই সিট হিয়ার।

শুধু বললাম, প্লিজ।

তারপর বসে সে বললো, তোমাকে একটি কথা বলি। আমার সায় পেয়ে বললো, তুমি ক্লাসের স্টাডির সময় আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকো কেন?

সহজভাবেই বললাম, তোমার মতো সুন্দরী এ দেশে আর দেখিনি, তাই।

দেখলাম তার লাল মুখ আরো লাল হয়ে গেছে। সেদিন উঠে যাওয়ার সময় শুধু বললো, ঠিক আছে দেখা হবে।

পরের দিন রীতিমতো ক্লাসে গিয়ে ইচ্ছে করেই পেছনের চেয়ারে বসলাম। দেখতে পেলাম সে শাদা স্কার্ট পরে এসেছে কলেজে। ক্লাসে আমার ডান দিকে দুই চেয়ার সামনে বসেছে। আমার কেন জানি তাকে দেখে হার্ট বিট বেড়েই চলছিল। সে আমার দিকে কয়েকবার তাকালো ঘুরে ঘুরে। আর আমার মনে হলো যেন কেউ আলো দিয়ে আমার ভেতরের সব কিছু দেখে নিচ্ছে। প্রথম ক্লাসের পর হঠাৎই সে আমার দিকে একটি কাগজ ভাজ করে দিল। কাগজটি খোলার পর মনে হয়েছিল আমিই হয়তো পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি। কাগজে লেখা ছিল, Do you love me - Mary.

তৎক্ষণাৎ আমার নোট প্যাড থেকে একটি কাগজে লিখলাম, I love you very much - Anam।

কাগজটি তাকে দিলাম। সে কাগজটি পড়ে একবারও আমার দিকে না তাকিয়ে ক্লাস থেকে বের হলো। আমিও তার পেছনে বের হলাম। দেখলাম উপরের তলার একটি ক্লাস রুমে গিয়ে সে ঢুকেছে। আমিও ওই রুমে ঢুকলাম। রুমে কেউ ছিল না। মেরির দিকে তাকালাম। মেরি আমার সামনে চলে এলো। নীরব সেই মুহূর্তে কি হয়েছিল কেউ হয়তো জানি না। মেরি আমার ঠোটের ওপর তার ঠোট রাখলো এবং আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম। প্রায় দুই মিনিট এভাবে থাকার পর আমাকে জড়িয়ে ধরেই বললো, I love you too.

তারপর এখান থেকেই আমাদের ভালোবাসা শুরু। পরে সে আমার কাছ থেকে আমার সম্পর্কে অনেক কিছু জানলো। আমিও তার সম্পর্কে জানলাম। তার বাবা মায়ের সে একমাত্র সন্তান। বাবা মারা গেছেন, মা ব্যাংকে চাকরি করেন ইত্যাদি। তারপর লন্ডনের অনেক জায়গায়ই মেরির সঙ্গে ঘুরেছি। বিশেষ করে মিউজিয়াম, থিয়েটার ও ছবি দেখে। থিয়েটারে তাকে কতো যে চুমু দিয়েছি তা নিজেও জানি না।

একদিন আমার চাচা-চাচিরা সবাই ওয়েস্ট সাসেক্সে আমার চাচার শালির বিয়েতে উপস্থিত হওয়ার জন্য এক সপ্তাহের জন্য গেলেন। কলেজে পরীক্ষার কথা বলে আমি থেকে গেলাম। বাসায় একা। তাই মেরিকে ফোন করে অনেকভাবে বোঝানোর পর রাজি করালাম যাতে তার মাকে বুঝিয়ে আসে যে, তার এক বান্ধবীর বাসায় রাতে থাকবে সে।

পরের দিন কলেজ শেষ হওয়ার পর মেরিকে নিয়ে আসি আমাদের বাসায়। চাচির একখানা শাড়ি বিছানায় দেখে সে হঠাৎ জেদ চাপালো শাড়ি পরবে বলে। বললাম, ঠিক আছে, তুমি পরো।

সে বললো, আমি তো আগে কখনো পরিনি তুমি পরিয়ে দাও।

পড়লাম মহা ঝামেলায়। কিভাবে শাড়ি পরতে হয় সেই আইডিয়া আমারও নেই। তাকে বললাম, ঠিক আছে, তোমার স্কার্ট খুলতে হবে না, উপরেরটি খোলো।

সে সহজভাবেই উপরের অংশটি খুললো। শুধু ব্রা পরা অবস্থায় মনে হয়েছিল দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর বুক যেন আমার সামনে রয়েছে।

আমি মেরিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম এবং আমার হাত তার স্তনে রাখতেই বললো, প্লিজ, এখন না, আগে শাড়ি পরাও তারপর।

মেরিকে ছেড়ে শাড়ি নিয়ে স্কার্টের ইলস্টিকে অপরিপক্ক হাতে কোনো রকমে শাড়ি গুজে পেচিয়ে পরালাম। সে তো মহা খুশি। এদিকে আমার তো আর তর সইছে না।

বললাম, আমারটা কোথায়।

মেরি আমাকে ধাক্কা মেরে বিছানায় ফেললো এবং আমার ওপর সে পড়লো। তারপর শরীরের সকল কাপড় এক এক করে সরালাম। এতো সুন্দর দেহ আমার মনে হয় জীবনে আর কখনো দেখবো না। এ এক অপরূপ রূপ যা লিখে বোঝানো অসম্ভব।

তারপর শুরু হলো জীবনের অন্য অধ্যায়ের সূচনা। সমস্ত রাতই মেরিকে অনেক কিছু দিলাম এবং অনেক কিছু নিলাম। সপ্তাহে বাকি কয়েকদিনও কলেজ থেকে এসে এভাবে চলেছে। এরপর অনেক দিন চলে গেছে অনেকবারই মিলিত হয়েছি। তবে প্রথম মিলনটা যেদিন হয়েছিল সেদিনের স্মৃতি হিসেবে ছিল একটি শাড়ি। পরে ইনডিয়া গার্ডেন থেকে একটি শাড়ি তাকে গিফট দিয়েছিলাম।

সে বলেছিল, শাড়ি তো পরতে পারি না। তবে এটা রাখবো তোমার সঙ্গে বিয়ের রাতে শাড়িটা তুমি আমাকে পরাবে।

ফাইনাল পরীক্ষার পর দেশে তিন মাসের ছুটিতে এসেছি। আমার পরিবারকে মেরির কথা বলেছি এবং তার ফটোও দেখিয়েছি। সবার পছন্দ হয়েছে। এছাড়া মেরি আগে থেকেই বলেছে বিয়ের আগে সে মুসলমান হবে। ইংল্যান্ড যাওয়ার পরই মেরিকে বিয়ে করবো।

মৌলভীবাজার থেকে

আজীবন

– শারমীনা হক জলি

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরের সকাল। আমার দাদুর ভাই দাদুর জন্য একটি চমৎকার শাদা শাড়ি নিয়ে এলেন। আমরা সবাই শাড়ি দেখছি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আমার এক কাজিন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, তুই শাড়িটা পরিস তো। বিকেলবেলা লাল ব্লাউজের সঙ্গে শাড়িটা পরলাম। কিন্তু ওনাকে আর দেখছি না। যাক, কিছুক্ষণ পর ওনাকে পেলাম বিলের ধারে পাকা রাস্তায় বসে আছেন। ওনার কাছে গেলাম। তিনি উঠে আমার কাছে এলেন। ভালো করে দেখে বললেন, ভেরি নাইস।

আমি ঘরে ফিরে এলাম।

তার দুই তিন দিন পর এক সন্ধ্যায় আমাকে ডেকে নিলেন ওনার একান্ত সান্নিধ্যে। তারপর আমার কাধে হাত রেখে বললেন, তোকে একটা কথা বলতে চাই।

বললাম, বলেন।

তিনি অনেক কষ্টে বললেন, জলি, আই লাভ ইউ।

ওনার কথা শুনে তো আমি মহাখুশি। ভাবতেও পারিনি তার মতো একজন ছেলে আমাকে ভালোবাসবে। তবে আমার মনে হয়, ওই দিনের শাড়ি পরার পরই আমার প্রতি তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। এখন আমাদের ভালোবাসার কথা সবাই জানে। কিন্তু কোনো বাধা নেই। ওই শাড়িটাই যেন আমাদেরকে আজীবনের জন্য বেধে ফেলেছে।

নরসিংদী থেকে

কালো অধ্যায়

– দেলোয়ার হোসেন সুমন ভূঁঞা

চোদ্দগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে ডিগ্রি পরীক্ষা দিচ্ছি। আট সাবজেক্ট এরই মধ্যে হয়ে গেছে। ব্যবস্থাপনা পরীক্ষা এক মাস পর। ভাবছি কি করা যায়। ব্যবস্থাপনার জন্য এতো বড় সময়ের প্রয়োজন নেই। আগে ভালোভাবে পড়া আছে বলে খুব একটা পড়তে হবে না। এতো বড় সময় কি করবো তা নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই।

একদিন ভাত খাওয়ার সময় মা বললেন, সুমন, তুই তো ইনডিয়া যাস। এবার যদি যাস তাহলে তোর বন্ধুদের কাছ থেকে আমার জন্য দুটো শাড়ি আনিস।

বললাম, মা, আমার বন্ধুরা তো স্মাগলিং করে না। তবে তোমাকে আমি শাড়ি এনে দেবো।

আমার বোনটা যে জাতের মেয়ে তাতে মায়ের জন্য কিছু কিনতে হলে তার জন্যও সেটা কিনতে হবে। তাই হিংগুলা গিয়ে বোন ঝর্নাকে জিজ্ঞাসা করলাম তার শাড়ি আসলে লাগবে কি না। বোন আমার কথাতে পাচ হাতে রাজি হয়ে আমাকে কিছু টাকাও দিয়েছে। তবে এই টাকা শাড়ির জন্য নয়, আমার পকেট খরচের জন্য। তার যা কিছু কেনার প্রয়োজন হবে তা আমাকে কিনতে বলবে। কিন্তু একটা টাকাও দেবে না।

যাক, এখন আমার শাড়ির প্রয়োজন। ইনডিয়ার বন্ধু জগ, বাদল শাহ এবং বিক্রমকে একটা চিঠি দিলাম চারটি শাড়ি এনে দিতে পারবে কি না জানার জন্য। দুই দিন পর তাদের (জগ, বাদল শাহ এবং বিক্রম) চিঠিতে জানতে পারলাম, শাড়ি এনে দিতে পারবে। তবে আমি সঙ্গে গিয়ে শাড়ি আনলে তারা অত্যন্ত খুশি হবে।

শাড়ি আনার জন্য তাদের প্রস্তাবে রাজি হলাম। দুঃখের বিষয়, এই শাড়ি যে আমার জীবনে একটি কালো অধ্যায় সৃষ্টি করবে তা ভাবতে পারিনি।

আমার ব্যবস্থাপনা পরীক্ষার পাচ দিন আগে জগ, বাদল শাহ এবং জগের প্রেমিকা আশিকার সঙ্গে ইনডিয়ার উদয়পুর (বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে একশ কিলোমিটার ভেতরে) গিয়ে চারটি শাড়ি কিনলাম। শাড়িগুলো আমরা সবাই একে একে পছন্দ করে কিনলাম। এই শাড়িগুলো যে আমার মা এবং বোনের কপালে জুটবে না তা কল্পনাও করতে পারিনি। শাড়ি কেনা ও ঘোরাঘুরি করতে রাত হয়ে গেছে। এখন বাড়ি ফেরার পালা।

আমার ইনডিয়ান বন্ধুদের গ্রামের নাম ডিমাতলী। ডিমাতলী গ্রামটি দক্ষিণ ত্রিপুরা বিলোনিয়া জেলার বাংলাদেশের চোদ্দগ্রাম থানার আমজাদের বাজার নামে স্থানের সীমান্তের পূর্বপাশে অবস্থিত। গ্রামটি

মোটামুটি আধুনিক পর্যায়ের। গ্রামটিতে গাড়ি চলাচলের রাস্তা আছে তবে বড় গাড়ি চলে না, কমান্ডার জাতীয় ছোট গাড়ি চলাচল করে।

ওই কমান্ডার জাতীয় ছোট গাড়ি করে আমরা রাত দশটায় ডিমাতলী এসে পৌছালাম। এবার আমাকে বাংলাদেশে আসতে হবে। সীমান্তে একেবারে কাছে। রাত হয়েছে বিধায় বিডিআরের ভয় আছে। প্রচুর পরিমাণে চোরাচালান হয় বলে বিডিআর রাতে প্রহরা দেয়। আমি ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আসছি। বন্ধুরা আমাকে সীমান্ত পর্যন্ত পৌছে দিল। তারা আমাকে পৌছে দিয়ে সীমান্ত পার করে দেয়া মাত্র চারদিক থেকে চারজন বিডিআর এগিয়ে এসে আমাকে গ্রেফতার করলো।

আনুমানিক রাত তিনটা। বিডিআর ক্যাম্পের একটি অন্ধকার মশারিবিহীন রুমে শুয়ে আছি। খিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। তারা আমাকে কিছু খেতে দেয়নি।

সকাল দশটায় বিডিআর-এর একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা এসে আমাকে বললেন, চোরাকারবারী করার জন্য তোমাকে কুমিল্লাতে চালান করে দেয়া হবে।

এখন আমি কি করবো! উর্ধতন কর্মকর্তার পায়ে জড়িয়ে ধরে আমার বিস্তারিত সমস্ত কিছু বললাম। তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন। সম্ভবত ডিগ্রি পরীক্ষা শেষ হয়নি তাই।

আমার বাড়িতে খবর দেয়া হলো। দুই দিন পর ছাড়া পেলাম। কিন্তু তারা আমার মা, বোনের জন্য কেনা শাড়ি আর ফেরত দিল না। ফিরিয়ে দেবে কিভাবে! এই শাড়িগুলো তো আমার জীবনের এক কালো অধ্যায়। এই কালো অধ্যায়ের জন্য দায়ী কে?

চোদ্দগ্রাম থেকে

পীরের পরামর্শ

– মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন

এ কাহিনী আমার বেয়াইন বেবীআপাকে নিয়ে। বেবীআপা ছিলেন আমার চাচাতো ভাইয়ের শালি। বয়সে আমার চেয়ে প্রায় চার পাচ বছরের বড়। লম্বায় আমার চেয়ে খাটো। সেই চাচাতো ভাইয়ের বাসায় যাবার সুবাদে বেবীআপার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয়। বেবীআপা তার দুলাভাইয়ের বাসায় থেকে পড়ালেখা করতেন। আমার ভাই কুয়েতে থাকতেন। ভাবী আর তার বোন এবং আমার চাচি থাকতেন বাসায়। সেই হিসেবে আমি মাঝে মধ্যে যেতাম চাচার বাসায়। বেবীআপার জন্মদিনে তার সঙ্গে আমার আরো ঘনিষ্ঠতা হয়। আকার ইঙ্গিতে তাকে যে ভালোবাসতাম সেটা বোঝাতাম। তিনি বুঝেও না বোঝার ভান করতেন। তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এমন কিছু নেই যে করিনি। আর আমার সবসময় সঙ্গী ছিলেন আমার বন্ধু নূর ইসলাম।

১৯৯৩ সালের কথা। বেবীআপা, আমি, ভাবী আর নূর ইসলামসহ অনেকে বেড়াতে গেলাম। আমার চাচাতো বোনের বাসায় কাশিমপুর। সেখানে নির্জন পরিবেশে আমার আবেগ আরো বেড়ে গেল। দুলাভাইকে গিয়ে বললাম আমার মনের কথা। দুলাভাই বললেন বেবীআপাকে। শুনে বেবীআপা দিলেন আমাকে কি যে বকা। তবুও দমলাম না। তাকে বশ করার নানান মন্ত্র খুজতে লাগলাম।

চ্যালেঞ্জ করলাম যেভাবেই হোক বেবীকে বিয়ে করবো। কিন্তু বিধি বাম, বেবীআপা উল্টো রথে চলেন।

এমন সময় আমার বন্ধু একজন ফকিরের সন্ধান দিলেন। সেই বন্ধু নাসিরের সঙ্গে গেলাম আতকা পীরের দরবারে। জট বাধা পীর আমাকে দেখে নানান বুজরুকি দেখাতে লাগলেন। তার জটার মধ্যে থেকে গাজা বের করে সেটা বানিয়ে কলকি ধরালেন। আমাকে বললেন, একটা টান দে।

আমি না করলাম

ধমকে দিলেন, টান।

চোখ বন্ধ করে দিলাম একটা টান। মাথা যেন ঘুরে গেল।

এবার বল তোর মনের কথা।

গাজার টানে এমনিতে মাথা ঘুরছিল। সঙ্গে ছিল ঘর ভর্তি গাজার ধোয়া। এর মধ্যে বেবীর কথা খুলে বললাম।

বললেন, পাচশ টাকা দে।

অতো টাকা আমার কাছে ছিল না। দুইশ টাকা দিলাম।

তোর প্রিয়ার মাথার চুল, শাড়ির আচল ও নখ যোগাড় করে আনবি। তাবিজ বানিয়ে দেবো। দেখবি সুড় সুড় করে তোর ঘাড়ে এসে পড়বে। সঙ্গে বাকি টাকা আনবি।

সব শুনে চলে এলাম।

এখন আতকা পীরের কথা মতো চুল ও নখ যোগাড় করলাম। কিন্তু শাড়ির আচল জোগাড় করবো কোথে কে? বেবীআপা সারাক্ষণ সালোয়ার কামিজ পরে থাকেন। শাড়ি পরতে দেখিনি। কি যে করি। হঠাৎ সুযোগ এসে গেল। একদিন তাদের বাসায় যেতেই বেবীআপা বললেন, চলো, তোমাকে নিয়ে ঘুরে আসি।

অবাক হয়ে বললাম, কোথায়!

সেদিন ছিল তাদের কলেজে র‍্যাগ ডে। সবাই শাড়ি পরে যাবে। এই সুযোগে রোডের দোকান থেকে দশ টাকা দিয়ে একটা কাচি কিনে আনলাম, সুযোগ মতো তার শাড়ির আচল কাটবো। বেবীআপা সেদিন অপরূপ সেজেছিলেন। চাচাতো ভাইয়ের পাঠানো দামি একটা ইনডিয়ান শাড়ি, তার রঙ কলাপাতা ও খয়েরির মিশেল ছিল।

রিকশা করে যখন যাচ্ছিলাম তখন দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলাম। এতো সুন্দর শাড়ি কাটা ঠিক হবে তো! কিন্তু সুযোগ হয়তো আর আসবে না। তাই তার আচল নিয়ে কাটতে লাগলাম। অর্ধেক কেটেছি। হঠাৎ তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেলাম হয়তো আমার আনাড়িপনার জন্য। বেবীআপা রিকশা থামাতে বললেন। আমাকে রিকশা থেকে নামতে বললেন। নামলাম।

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার এই ক্ষতিটা করার কারণ কি?

আমি চুপচাপ ছিলাম। কোনো উত্তর দিতে পারিনি।

তিনি চলে গেলেন। আমি একা রাস্তায় দাড়িয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। তাকে বোঝাতে পারিনি তার কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছা আমার ছিল না। শুধু তাকে পাওয়ার ইচ্ছাটাই ছিল। বেবীআপা আমাকে ক্ষমা করবেন। এতোদিন পরে আজো আপনাকে ভালোবাসি। অভিশাপ দিই সেই আতকা পীরকে

যার কারণে আমি আর বেবীআপার সামনে দাড়াতে পারিনি। তবে প্রতিজ্ঞা করেছি, সুযোগ যদি পাই তাহলে তার থেকে দামি একটা শাড়ি তাকে দেবো যদি তার বিয়েও হয়ে যায়।

আজিজ মহল্লা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

অভিনয়

– আহমেদ

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এক সঙ্গেই পড়তাম। নটরডেম কলেজের শৃঙ্খলা ডিঙিয়ে ভর্তি হলাম জীব বিজ্ঞান অনুষদের এক বিভাগে অনার্স কোর্সে। প্রথম দিকের কথা। বিভাগীয় ভবনের গাড়ি বারান্দার উচু এক কোণে দুই তিনজন সহপাঠীসহ বসে আছি। দশ পনেরো মিনিট পর প্রথম ক্লাস শুরু হবে। সে সময় রিকশা থেকে নামলো ছিপছিপে এক মেয়ে অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে। হালকা গোলাপি জামা, শাদা সালোয়ার। কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা বিভাগে ঢুকে পড়লো। পাচ দশ মিনিট পর ক্লাসে গিয়ে দেখি আরো চার পাচজন মেয়ের সঙ্গে বসে আছে মাঝামাঝি সারিতে। আরো কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। এর মধ্যে জেনে গেলাম মেয়েটি যে জেলা শহর থেকে এসেছে, আমার পৈত্রিক নিবাসও একই জেলায়। জানলাম ঢাকায় বড় ভাইয়ের বাসায় থাকে। তাকে দেখি কখনো করিডরে, কখনো ক্লাসে, কখনো বা ফার্মাসি বিভাগের গেট পেরিয়ে রিকশায় উঠতে। এক অদ্ভুত অনুভূতি ক্রমেই হৃদয়কে স্পর্শ করছে। ইচ্ছা হচ্ছিল কোনো অজুহাতে আলাপ জমানোর। তার নিস্পৃহ ভাব দেখে কিছুতেই সাহসী হতে পারছিলাম না।

এর মধ্যে কয়েকটা ক্লাস টেস্ট–এর রেজাল্ট বের হলো। আর সেটাই আমার জন্য সুযোগ বয়ে নিয়ে এলো। ক্লাস টেস্ট–এ প্রথম হওয়ার সুবাদে অন্যদের সঙ্গে মেয়েরাও কিছুটা আগ্রহী হয়ে উঠলো। সেই মেয়েটিও কংগ্রাচুলেট করলো। আমিও এক ফাকে জানিয়ে দিলাম যে ঢাকা শহরে জন্ম হলেও আমিও একই জেলার। সে কারণে হোক অথবা নোট প্রাপ্তির সুবিধার কারণেই হোক, এবার আমন্ত্রণ পেলাম বাসায় যাওয়ার। বড়ভাইয়ের বাসায় যেখানে সে থাকে। ব্যস, ছুটলাম পরদিনই। শুরু হলো আসা যাওয়া। বড়ভাই, ভাবী সবার সঙ্গে মিশে গেলাম। সবার সঙ্গে আলাপ করলেও তার সঙ্গে একা কথা বলতে ইচ্ছা করতো। ক্লাসমেট অথবা পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মাঝে মধ্যেই তার সঙ্গে আলাপ হতো। বাসায় তাকে প্রায় সব সময় সালোয়ার কামিজ পরাই দেখতাম।

তার বাসায় গিয়ে একদিন হঠাৎই শাড়ি পরা দেখলাম এবং সেদিনই ঘটনাটা ঘটলো। বাসায় আর কেউ ছিল না। পরীক্ষা সংক্রান্ত আলাপের ফাকে সিগারেট ধরাতে চাইলাম। কিছুটা নেশায়, কিছুটা স্মার্ট ভাব বজায় রাখার জন্য সিগারেট খেতাম। তখন অবশ্য স্মার্ট ভাবের ধারণা আমার এ রকমই ছিল। পকেটে ম্যাচ ছিল না। কিচেনে গিয়ে দেখলাম গ্যাসের চুলা জ্বলছে। কাগজ ছিড়ে চুলোর আগুনে সিগারেট ধরিয়ে জ্বলন্ত কাগজটি মাটিতে ফেলে দিলাম। ইতিমধ্যে সেও কিচেনে এসে দাড়িয়েছে। কখন যে জ্বলন্ত কাগজের আগুন তার শাড়ি স্পর্শ করছিল বুঝতেই পারলাম না। কিন্তু যখন টের পেলাম ততোক্ষণে শাড়ির অনেকটাই পুড়ে গেছে। আমি বিব্রত, হতবাক!

এমন হতেই পারে, শাড়িটা অতো দামি না ইত্যাদি বলে সে বার বার আমাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় আমার কি করা উচিত বুঝতে পারছিলাম না। ভাবলাম, তাকে একই রকম একটা শাড়ি অফার করি। কিন্তু আমি জানি আমার অফার নেয়ার মতো সম্পর্ক তার সঙ্গে আমার নয়। মধ্যবিত্ত ঘরের সদস্য হয়ে সত্তরের দশকে ছাত্র জীবনে দুই তিনশ টাকার একটা শাড়ি কেনা সহজ সাধ্য না হলেও তার জন্য কিছু করার চেষ্টা নিশ্চয়ই করতাম।

এরপর আরো সময় কেটে গেছে। কিছুটা বন্ধুত্ব ছাড়া আর কোনো গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়নি। মাস্টার্স পর্বে তার বিয়ে হলো এবং স্বামীর সঙ্গে প্রবাসে কর্মস্থলে চলে গেল। কি জানি কেন এ ধরনের শূন্যতা অনুভব করা শুরু করলাম! প্রবাস থেকে তার লেখা পত্রগুলো সযত্নে সংরক্ষণ করতাম। এর মধ্যে মাস্টার্স শেষ করে বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হলাম। আট বছর পর স্বামী, সন্তানসহ সে দেশে ফিরে এলো। আবার দেখা হলো। এবার দুজনেই বুঝতে পারলাম একে অন্যের প্রয়োজনীয়তা। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে মাঝে মধ্যেই বিদেশ যাওয়ার সুযোগ হয়। উপহার হিসেবে তার জন্য অনেক কিছুই কিনে আনি। গত মাসে ভারত থেকে দেখেশুনে দুইটি শাড়ি কিনে এনে তাকে উপহার দিলাম। এতো দামি শাড়ি দেখে কপট ক্ষোভ দেখালেও বুঝতে পারলাম বেশ খুশি হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম শাড়ি পুড়ে যাওয়ার কথা মনে আছে কি না।

সঙ্গে সঙ্গে বললো, মনে নেই আবার! কতো গঞ্জনা সইতে হয়েছে ভাবীর তার সাধের কেনা শাড়িটা পুড়ে ফেলায়। ভাইয়ের বাসায় থাকাটাই কঠিন হয়ে গিয়েছিল।

বলতে বলতে তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে গেল। বিষণ্ন মুখের পানে তাকিয়ে শুধু মনে করার চেষ্টা করলাম পচিশ বছর আগের সেই দিনটি। স্মৃতির আয়নায় ভেসে উঠলো শাড়ি পুড়ে যাওয়ার পর নিরুদ্বেগ মুখটি, স্বাভাবিক আচরণ, কিছুই হয়নি এমন ভাব। কষ্ট হচ্ছিল ভেবে সে সময়ের অভিনয়টা বুঝতে পারিনি বলে।

পূর্ণ নাম ঠিকানাবিহীন
ঢাকা থেকে

ভীতি

– মাহবুবুর রহমান ভুইয়া মনজু

মেয়েরা কি কুড়িতেই বুড়ি, নাকি শাড়িতেই বুড়ি?

আমার ধারণা দুটোই।

শাড়িটা হলো মেয়েদের বেড়ে ওঠার নির্দেশক। এতে আমার যতো বিপত্তি, ভয়, দুই ছেলেমেয়ের সুখী সংসার গড়তে এ ঢাকা শহরে চাকরির আবরণে ঢাকা আছি। সুযোগ পেলেই ছেলেমেয়েকে দেখতে চলে যাই। বাড়িতে থাকলে এদের খুনসুটি, আবদার মিটাই। তাই বাড়ি যেতে দুজনের জন্য খেলনা কিনে নিতে ভুলি না। ছেলেটা খেলনা পেলেই খুশি। কিন্তু মেয়েটার আবদার খেলনা নয়। প্রতিবারে ঢাকায় ফিরে আসতে মেয়ে বলবে, আব্বু আমার জন্য শাড়ি আনবে। ছয় বছরের এতোটুকু আমার তাফসিমণি শাড়িতে কি পেল? কিন্তু আমার শাড়ি নেয়া হয় না। আমার কেমন জানি ভয় হয় শাড়ি

পরলে মেয়েরা বড় হয়ে যায়। আর বড় হলে পরের বাড়ি চলে যাবে। আমি যে আমার তাফসিকে পর হতে দেবো না।

এবারও বাড়িতে মেয়ের শাড়ি নিলাম না কেন? এ নিয়ে পারভীনের সঙ্গে ঝগড়া হলো। ওর একরোখা কথা, মেয়ে বলে তার মেয়ের প্রতি আমার আদর নেই। কিন্তু পারভীনকেও আমার মেয়ে হারানোর ভয়ের কথা বোঝাতে পারি না। বোঝাতে পারি না মেয়েটা শুধু তার নয়, আমারও কলিজার টুকরা। শেষে রাজি হলাম শাড়ি কিনে নেবো। তবে পরের বাড়ি যেতে দেবো না। পাঠক-পাঠিকা আপনারা সাক্ষী রইলেন, আমার মেয়েকে আমি আজীবন চোখের আড়াল করবো না।

চকবাজার, ঢাকা থেকে

পুরুষ শাসিত সমাজে

– সারমিন সুলতানা হীরা

কলেজ ও ইউনিভার্সিটির মেয়েরা যে হারে থ্রি পিস পরে সে হারে শাড়ি পরে না। অথচ শাড়িই খুব মানানসই। আবার এ পড়ুয়া মেয়েগুলোই যখন কোনো অনুষ্ঠানে যাবে তখন পাইকারি হারে শাড়ি পরে। মেয়েরা শাড়ি পছন্দ করে। কিন্তু সমাজের কারণে শাড়ি পরতে অনিচ্ছুক।

শাড়ি পরলেই মেয়েদের নিয়ে কানাঘুষা শুরু হয় যেমন বৌ বৌ লাগছে, বৌ সাজতে চায়, বিয়ের পিড়িতে বসতে চায়, মা হতে চায়, কুড়িতে বুড়ি হতে চায় এগুলো শুনতে হয়।

আমাদের পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েদের শাড়ি কেন, হাতের একটা নখ নিয়েও ব্যঙ্গ করতে অসুবিধা নেই। অথচ বিয়ের পর এই পুরুষেরা নতুন বৌকে শাড়ি পরা অবস্থায় পেতে চায় সব সময়।

জুরাইন, ঢাকা থেকে

জ্বলন্ত প্রমাণ

– মণি

আকাশকে এতো সুন্দর দেখায় কারণ তার অঙ্গে জড়ানো থাকে নীল রঙ। বসন্তকে এতো ভালো লাগে কারণ ফুল তাকে জড়িয়ে রাখে। আর বাঙালি নারীকে সুন্দর লাগে কারণ তার অঙ্গে জড়ানো থাকে শাড়ি।

সত্যি শাড়ি বাঙালি নারীর এক অমূল্য সম্পদ। এই শাড়ি বাঙালি নারীকে করে অপরূপা, অনন্যা। শাড়ি ছাড়া বাঙালি নারীর রূপ যেন ফুটেই ওঠে না।

তাই শাড়ি নিয়ে রয়েছে আমাদের অনেক হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কাহিনী। তেমনি আমারও রয়েছে একটি কাহিনী। তবে আমার কাহিনী একজনকে আপন করে নিবিড় করে কাছে পাবার কাহিনী।

ঠিক আছে ঘটনাটা খুলেই বলি।

আমার মেজবোন। ওর চার তলা বাড়ি। দ্বিতীয় তলায় ওর ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে। আর সব ভাড়া দেয়া। ওর স্বামী বাইরে থাকে। ওর তিন তলার এক ফ্ল্যাটে দুটি ছেলে থাকতো। শাহীন ও টগর নাম

তাদের। শাহীন নামের ছেলেটি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সেকেন্ড ইয়ারে পড়তো। ও খুব ভদ্র এবং অমায়িক ছিল। দেখতেও সুন্দর ছিল।

ছেলেটি মেজ আপুকে এক সময় বোন বানায়। ভাই–বোন হিসেবে ওরা দুজন দুজনকে খুব পছন্দ করে এবং সব সময় যাওয়া আসা করে।

তারপর আপু ছেলেটির জন্মদিনে একটি প্যান্ট গিফট দেয় এবং ছেলেটি আপুর জন্মদিনে শাড়ি দেয়ার কথা বলে ও অনুরোধ করে বলে যেন আপু নিজে পছন্দ কর কেনে এবং মার্কেটে যায়। আপু রাজি হয় এরপর আমাকে সঙ্গে নিয়ে আপু নির্ধারিত সময়ে মার্কেটে যায়। ছেলেটি আগে থেকে দাড়িয়ে ছিল। দেখতে পেয়ে কাছে এলো। এবং কথা বলতে বলতে আমরা মার্কেটে ঢুকলাম। সেদিন প্রথম ছেলেটির সঙ্গে কথা হলো। আগে দেখা হলেও কথা হয়নি। ছেলেটি আপুকে শাড়ি কিনে দিল এবং সঙ্গে আমাকেও একটি শাড়ি কিনে দিল। শপিং করার পর কিছু নাশতা করে সেদিনের মতো আমরা চলে আসি।

সে যাই হোক। এই গিফট আদান–প্রদান ঘটনা আমাদের ফ্যামিলি ও আপার শ্বশুরবাড়ির লোকজন জেনে ফেলে। এবং তার প্রেক্ষিতে ছেলেটিকে চরম অপমান করে বাসা থেকে উঠিয়ে দেয়া হয়। ছেলেটি চরম লজ্জা আর মিথ্যা অপবাদ মাথায় নিয়ে চলে যায়। কিন্তু আমি জানতাম ওদের সম্পর্ক আপন ভাইবোনের চেয়েও গভীর ও সুন্দর ছিল।

আর সেই ঘটনার পর থেকেই ওর প্রতি প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ি। এবং ক্ষমা চাওয়ার জন্য ওর ঠিকানা খুজে বের করি ও যাই।

দুঃখিত শাহীনভাই। ওরা যে ব্যাপারটা এভাবে দেখবে ভাবতেই পারিনি। নিষ্পাপ একটি সম্পর্ক যে এভাবে কলুষিত করবে বুঝতে পারিনি। শাড়ি কিনতে যাওয়াই ভুল হয়েছিল। আর সেই শাড়িই কাল হলো।

ছিঃ, ছিঃ এভাবে বলছো কেন? আসলে আমারই ভুল ছিল। সে যাই হোক। এখন বলো শাড়িটি কি পরেছিলে?

না পরিনি। শাড়িটি আর পরতে ইচ্ছে করে না।

প্লিজ ও কথা বলো না। শাড়িটা পরে একদিন আসো, দেখি তোমাকে কেমন লাগে।

হঠাৎ ওর এ ধরনের কথায় অবাক হচ্ছিলাম আবার খুশিও হচ্ছিলাম।

আবার বললো, মণি, আসবে তো?

ঠিক আছে আসবো।

তোমার জন্য তোমার স্কুলের সামনে দশটার দিকে অপেক্ষায় আমি থাকবো।

বিদায় নিয়ে চলে এলাম। বাসায় গিয়ে সারাক্ষণ অন্য রকম আনন্দে বার বার শিহরিত হচ্ছিলাম।

পরদিন সকালে উঠে গোসল করে নিলাম। নয়টার মধ্যে শাড়িটি পরে নির্ধারিত স্থানে গেলাম।

ও আগে থেকে দাড়িয়েছিল।

হাত ইশারা করে ডাকলাম।

কাছে এসে বললো, রিকশা থেকে নামো, বেবিট্যাকসি নিয়ে যাবো।

বললাম রিকশাতেই যাবো।

ও বললো, তোমার বুঝি খুব সাহস। অগত্যা ও উঠে এলো এবং রিকশাচালককে বললো, গুলশান দুই নাম্বার পার্কে চলো। রিকশা ছুটে চলছে।

কি হলো কিছু বলছেন না যে।

পার্কে গিয়ে বলি। রিকশা থেকে নেমে সুন্দর একটা জায়গা খুজছিলাম। আগের রাতে বৃষ্টি হওয়ায় ঘাসের নিচে পানি কাদা জমেছিল। পার্ক দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। তাই আনমনে হাটতে গিয়ে হোচট খাই এবং আমার শাড়িতে কাদা লেগে যাওয়াতে মন খারাপ করি। তখন ও বললো, মন খারাপ করছো কেন? এর চেয়ে সুন্দর এবং দামি শাড়ি কিনে দেবো।

আমি ওর পিঠে চাপড় মেরে বললাম, আমাকে আরো শাড়ি কিনে দেবেন মানে! এই ছেলে? মানে কি।

দেবো না মানে। বৌকে তো মানুষ শাড়ি কিনে দেয়। আর তুমি তো আমার বৌ হবে ইনশাআল্লাহ। ওর এ ধরনের কথায় অবাক হচ্ছিলাম।

এভাবেই আমাদের কথা চলতে থাকে। এক সময় আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে একজন আর একজনকে ছেড়ে যাবো না। তারপর অনেক বার আমাদের দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে এবং মাঝে মধ্যে ও সুযোগ পেলে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিয়েছে।

দীর্ঘ দুই বছর প্রেম করার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে আমার এসএসসি পরীক্ষার পর বিয়ে করবো। ২৩ জুন ১৯৯৮ মঙ্গলবার বিয়ের তারিখ ঠিক করি। তার আগের দিন আমরা মার্কেটে গিয়ে নিজেদের বিয়ের বাজার নিজেরা করি। কোনো মেয়ে তার বিয়ের শাড়ি নিজে কিনেছে কি না আমার জানা নেই। কিন্তু আমি সেই মেয়ে যে, বিয়ের শাড়ি নিজে কিনেছি।

সেই শাড়ি পরে ২৩ জুন আমরা বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হই। এবং অবশ্যই কাজি অফিসে গিয়ে। অনেক ঝুট ঝামেলার পর আমাদের বিয়েটা দুপক্ষই মেনে নেয়। আমরা খুব সুখী।

সাধারণ একটা শাড়ি যে কিভাবে একটা মানুষের জীবনকে বদলে দিতে পারে আমি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তিন বছরের বিবাহিত জীবনে কতো শাড়ি কিনেছি। কিন্তু ওর দেয়া সেই শাড়িটার মতো প্রিয় শাড়ি আর নেই। তবে শাড়িই আমার প্রিয় পোশাক।

কাগমাইরপাড়া, পাবনা থেকে

পাটের শাড়ি

– রতন

যার শাড়িটার কথা লিখছি তার বয়স প্রায় সত্তর বছর হবে। শাড়িটা ছিল আমার প্রথমা দাদির। মাত্র সাত বছর বয়সে ওই শাড়ি পরে আমার দাদার সংসারে তিনি এসেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মহামারী কলেরায় তিনি অকালে প্রাণ হারান। আর ওই একই শাড়ি দিয়ে আমার দাদা তার দ্বিতীয়া স্ত্রীকে ঘরে এনেছিলেন। শাড়িটা ছিল বেগুনি জমিনের। সেই জমিনের বুকে ছিল সবুজ ছোট ছোট ফুল। পাড় ছিল সোনালি কারুকাজ করা। পাটের সুতায় তৈরি শাড়িটা দাদির কাছে বোধহয় বেশ অনাদরেই ছিল। কারণ একটাই সেটা ছিল ওনার প্রয়াত সতীনের।

সে যাই হোক। আমি যখন শাড়িটা পাই তখন তেলাপোকা তার বারোটা বাজিয়েছে। কিছুটা অংশ মাত্র ভালো ছিল।

প্রচণ্ড পুতুল খেলার নেশা ছিল। বান্ধবীদের সঙ্গে পুতুলের শাড়ি প্রতিযোগিতা ছিল তীব্র। কার কতো শাড়ি। গ্রাম থেকে পাটের শাড়ি নিয়ে ফিরলাম। আর আমার পুতুলের আলমারিতে বিরল একটা শাড়ির সংগ্রহ বাড়লো।

বান্ধবীদের মধ্যে আমার পুতুল ছিল সবচেয়ে ধনী। বাশের তৈরি আলমারি ছিল আমার পুতুলের আলিশান বাড়ি। সেখানে সবাই রাজকীয় পরিবেশে বাস করতো। আমার মা এতো বড় আলমারি ঘরে ঢুকাতে দিতেন না। তাই ঘরের পাশের গলিতে আমগাছের নিচে আলমারিটা থাকতো।

একদিন ঝড়-বৃষ্টির রাতে আমার পুতুলগুলো ভেসে গেল। পাশের বাড়ির রায়বাবু স্যার চিৎকার করে বলেছিলেন,

রতন তোর পুতুল আর শাড়ি ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু প্রচণ্ড ঘুমের কোলে এমনই বিভোর ছিলাম যে তা আমার কানে ঢোকেনি।

পরদিন সেখানে কিছু খুজে পাইনি। কেবল আলমারিটা উল্টে পড়েছিল। আর আমার বুকের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড তোলপাড়।

আবার শুরু হলো শাড়ি যোগাড় করা আর নতুন উদ্যমে পুতুল খেলা।

তেরো বছর আগে পুতুল খেলা ছেড়ে দিয়েছি। পুতুল নেই কিন্তু তাদের শাড়িগুলো মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করে ড্রয়ারে তুলে রেখেছি। কেন রেখেছি জানি না। কখনো কখনো শাড়িগুলো খুলে দেখি। অনেকের অনেক শাড়িখণ্ড আজো আছে কেবল সেই পাটের শাড়ি নেই। সেদিনের ঝড়-জলে সে অনেক দূরে হারিয়ে গেছে।

মহাখালি, ঢাকা থেকে

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট যেদিন এলেন

– মারীয়া

বাঙালি মেয়েদের শাড়ি পরার প্রবণতা ছোটবেলা থেকেই একটা শখে পরিণত হয়। শাড়ি ছাড়া নারী যেন পূর্ণতা পায় না। আজকাল ইওরোপের মেয়েরাও শাড়ি পরে। সদ্য জন্ম নেয়া একটি মেয়ে শিশুকে তার বাবা মা লাল শাড়ি পরিয়ে, বৌ সাজিয়ে ছবি তুলে স্মৃতির অ্যালবামে রাখেন। শাড়ি নিয়ে প্রায় প্রতিটি মেয়ের জীবনে স্মরণীয় ঘটনা তো অবশ্যই ঘটেছে। হ্যা, জীবনে প্রথম শাড়ি পরা আমার হৃদয়ে গভীরভাবেই দাগ কেটে আছে। অবশ্য একটা উদ্দেশ্য নিয়ে সেদিন আমাকে শাড়ি পরতে হয়েছিল।

১৯৮৯ সালে আমি হলি ক্রস স্কুলের ক্লাস সেভেনের ছাত্রী। বাংলা ক্লাস করছি হঠাৎ ভাইস প্রিন্সিপাল ম্যাডাম মাইকে ঘোষণা দিলেন যে, পরদিন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাসোয়া মিতেরা এবং মাদাম মিতেরা বাংলাদেশ সফরে আসবেন। সে জন্য ঢাকার প্রধান কয়েকটি গার্লস স্কুলের মেয়েদের স্বাগতম

জানানোর জন্য এয়ারপোর্টে যেতে হবে। ক্লাস টেন-এর ছাত্রীদের পরীক্ষা থাকায় সেভেন থেকে ক্লাস নাইন পর্যন্ত ছাত্রীদের শাড়ি পরে আসতে বলা হলো।

ম্যাডাম ঘোষণা শেষ করতেই আমাদের গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। পরের ক্লাসের টিচারের কাছে জানতে পারলাম পরদিন দুপুর বারোটা পর্যন্ত স্কুল হবে। ছুটির পর বাসায় গিয়ে শাড়ি পরে আসতে হবে। যাদের বাসা দূরে তারা স্কুলে শাড়ি নিয়ে আসবে। তাতের শাড়ি পরতে বলা হয়েছে। শাড়ি পরবো সে আনন্দ নিয়ে বাসায় গেলাম। গোসল করে খেতে খেতে মাকে সব বললাম। কিন্তু মায়ের তাতের শাড়ি পুরনো। মা বললেন নানুর কাছে যেতে।

খাবার শেষে দোতলায় নানুর কাছে গেলাম। নানু শুয়েছিলেন। আমাকে দেখে উঠে বসলেন। নানু বললেন, কি হয়েছে?

নাতি-নাতনির মধ্যে আমি সবার বড়। সে জন্য কোনোদিন কারো কাছ থেকে বিন্দুমাত্র অবহেলা পাইনি। তখন নানুর গলা জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেয়ে সব বললাম। নানু তখন উঠে গিয়ে আলমারি খুলে একটা নতুন তাতের শাড়ি বের করে দিলেন। বাবা তখন দেশের বাইরে ছিলেন। দেশে থাকলে নিশ্চয়ই তিনি শাড়ি কিনে দিতেন। নানুর শাড়ি পেয়ে খুশিতে গদ গদ হয়ে আরো কতোগুলো চুমু দিয়ে মায়ের কাছে এলাম। মাও খুব খুশি হলেন। আনন্দে আমার ছোট ভাইকে কোলে নিয়ে নাচতে লাগলাম।

শাড়ি পরবো, কেমন লাগবে, চুল কিভাবে বাধবো, শাড়ি সামলাতে পারবো তো! এসব ভাবতে ভাবতে রাত কাটলো। সকালে যথারীতি স্কুলে গেলাম আবার ফিরেও এলাম। মা খাবার নিয়ে বসেছিলেন। আমি গোসল সেরে খেয়ে নিলাম। মা আমাকে শাড়ি পরিয়ে দিলেন। চুল বেধে দিলেন এবং ফলস বেলি ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। যেহেতু শাড়ির রঙ ঘিয়ের মধ্যে সবুজ পাড় সেহেতু সবুজ চুড়ি ও টিপ পরিয়ে দিলেন।

আয়নার সামনে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম। নিজেকে কতো বড় লাগছে। মা আমার কপালে একটা চুমু দিয়ে নানুর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। নানুর কাছে গেলে নানু আদর করলেন আর বললেন, খুব সুন্দর লাগছে। ছোট খালাও বললেন, সবুজ পরী লাগছে। তখন আমার খুব লজ্জা লাগছিল। মা আমাকে স্কুলে পৌছে দিলেন। বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা হতেই কাকে কেমন লাগছে বললাম।

দুইটায় বাস এলো। তিনটি বাসে ম্যাডামদের সঙ্গে ছাত্রীরা উঠলাম। সোয়া দুইটায় বাস রওনা দিল। সবার আলোচ্য বিষয় ছিল শাড়ি। শাড়ি পরে কার, কি রকম লাগছে তা বললাম। কেউ বললো, নিজেকে মা মনে হচ্ছে। কেউ টিচার, কেউ মহিলা। আমিও বললাম, নিজেকে একদিনের জন্য হলেও খুব বড় মনে হচ্ছে। এক বছর বয়সে বাবা-মা আমাকে শাড়ি পরিয়ে ছবি তুলেছিলেন। কিন্তু তখন শাড়ি কি তাই জানতাম না। এ জন্য কোনো অনুভূতিও ছিল না।

এয়ারপোর্টে পৌছালে লাল গালিচার সামনে সারি বেধে দাড়ালাম। একজনের হাতে ফুলের ঝুড়ি আর অন্যজনের হাতে লাল-সবুজ ফিতা। প্লেন বিকাল চারটায় ল্যান্ড করলো। অতিথিদের আমন্ত্রণ জানাতে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও মিসেস এরশাদ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসেছিলেন। লাল গালিচার ওপর দিয়ে হেটে যাওয়ার সময় তাদের ফুল ছিটিয়ে, ফিতা উড়িয়ে স্বাগতম জানানো হলো।

এখন ফেরার পালা। বাসায় পৌছে নানুকে শাড়িটা ফেরত দিতে গেলাম। তিনি না নিয়ে আমাকে দিয়ে দিলেন। প্রথম শাড়ি পরা আর শাড়ি উপহার পাওয়া এ দুটি আনন্দ যেন একই দিনে পাবার ছিল।

শাড়িটা এখনো সযত্নে রেখে দিয়েছি। দ্বিতীয়বার পরা হয়নি। এখন আমি চাকরিজীবী। প্রথম বেতন পেয়ে তিনটা শাড়ি কিনেছিলাম নানু,মা এবং নিজের। এখন আমি শাড়ি পরতে পারি। কিন্তু সেদিনের মতো আনন্দটুকু আর পাইনি। সেদিনের মতো অনুভূতি কখনো জাগেনি। আজো সেদিনের কথা মনে পড়লে খুশিতে মন ভরে ওঠে।

ঢাকা থেকে

অপয়া

– ঐন্দ্রিলা

নতুন বিয়ে হওয়া ভাইয়ের বাসায় বেড়াতে গিয়ে ভাইবৌ–এর একটা শাড়ি খুব পছন্দ হয়ে গেল। কৃম কালারের শাড়ির পাড়, মেরুন আর সারা গায়ে ছড়ানো–ছিটানো কৃম, সবুজ মেরুনের ডিজাইন। এতো ভালো লাগলো, ভাইবৌকে বলার সঙ্গে সঙ্গে শাড়িটা পেয়ে গেলাম।

খুশিতে আচ্ছন্ন আমি কবে, কোথায় শাড়িটি পরবো সে চিন্তায়ই অস্থির। কবে পরবো, তর সইছিল না। এমন সময় এসে গেল ইস্টার্ন প্লাজাতে কেনাকাটা করার সুযোগ। পরিচ্ছন্ন পরিবেশে কেনাকাটা করবো বলে শাড়িটির উদ্বোধন করলাম।

ইস্টার্ন প্লাজার এস্কেলেটার–এর পাশে দাড়িয়ে ব্যাগে কতো টাকা আছে একটু গুণে নিলাম। পাশে দাড়ানো ছিল খুব ভদ্র কাপড়–চোপড় পরা বিশ একুশ বছরের একটি মেয়ে। এস্কেলেটার–এ উঠতেই পেছন দিক থেকে একটু ধাক্কা খেলাম। দেখি মেয়েটি আমার সঙ্গেই উঠেছে। এক সঙ্গে উঠে মেয়েটি বাম দিকে আর আমি ডান দিকে গেলাম। দোকানে এসে কাপড়–চোপড় পছন্দ করে টাকা দেবো বলে ব্যাগ খুলতেই আমার চোখ ছানাবড়া, টাকা নেই। বুঝলাম মেয়েটির কাজ। কষ্ট লাগলো। ভাবলাম, এই বয়সী একটা মেয়ে এ কাজ করতে কতোখানি দক্ষ।

এর বেশ কিছুদিন পর বাংলা একাডেমিতে একটা অনুষ্ঠানে যাবো বলে শাড়িটি বের করলাম, আমার প্রিয় শাড়ি কৃম, সবুজ–মেরুন। অনুষ্ঠান শেষে বাসায় ফেরার পথে নিউ মার্কেটের মোড়ে আমাদের গাড়ি ট্রাফিক সার্জেন্টের নজরে পড়লো। কেন গাড়ি থামানো হলো বুঝলাম না। ড্রাইভার তার কাগজপত্র দেখাতে গিয়ে দেরি করছে বলে গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেলাম। হাতে ছিল আমার বিদেশ থেকে পাঠানো বন্ধুর দেয়া সুন্দর একটা পার্স। ঝামেলা শেষ করে গাড়ি নিয়ে মিরপুরের লম্বা রাস্তার অর্ধেক পথ এসেই দেখি আমার পার্স গায়েব। কোথায়, কিভাবে ওটা পড়ে গেছে টেরই পাইনি। বাসায় এসে শুধু বললাম, হায়রে আমার প্রিয় শাড়ি!

এর বছর খানেকের মধ্যে আমার স্বামী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেলেন। নিশ্চিত মরণ রোগে তিনি আক্রান্ত। ঘর–বাড়ি, ছেয়েমেয়ে–স্বামীর সেবা, চিকিৎসা এবং সর্বোপরি মানসিক দুশ্চিন্তায় নিজের তখন বেসামাল অবস্থা। মৃত্যুর কিছুদিন আগে আমার স্বামী আরোগ্য নিকেতনে ভর্তি হন। আমার স্বামী

যেদিন মারা যান তার আগের রাতে কিছু কাপড় নেয়ার জন্য বাসায় আসি। দেশে তখন প্রচণ্ড লোডশেডিং। অন্ধকারে হাতড়ে যে শাড়িটি সামনে পাই সেটি পরেই হাসপাতালে চলে যাই। ওখানে পৌছার পর পরই আমার স্বামী কোমাতে চলে যান এবং খুব সকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

লাশ নিয়ে যখন বাসায় ফিরলাম, স্বামীর লাশ নিয়ে শ্বশুরালয়ে যাবো বলে কাপড় বদলাতে গিয়ে আমার খেয়াল হলো পরনে আমার সেই কৃম, মেরুন-সবুজ শাড়ি।

কি করবো সেই শাড়ি, কাউকে দিয়ে দেবো! না, ঠিক করলাম থাকুক স্মৃতি হিসেবে।

তারও তিন বছর পরের কথা, যে ভাইবৌ শাড়িটি আমাকে দিয়েছিলেন তাদের কাছে একই সঙ্গে মিরপুরের স্মৃতি জড়ানো বাড়ি ছেড়ে ধানমন্ডিতে থাকতে এলাম। এক সঙ্গে থাকার সময়ে তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে ভাইবৌ এ বাসা ছেড়ে অন্যত্র বাসা নিলেন। তাদের সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, তারা আমার মুখও দেখতে চায় না।

আমার প্রশ্ন, এখানেও কি সেই শাড়ির ছায়া। জানি না। শুধু মাঝে মধ্যে শাড়িটা বের করে দেখি। আমার দুঃখের স্মৃতি জড়ানো কৃম, মেরুন-সবুজ শাড়ি।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

সোনাবৌ

– ইমন

ইশ! কখন থেকে অপেক্ষা করছি। এখনো আসছে না। আজ আমাদের বাংলার পুরনো ঐতিহ্য সোনারগাওয়ে বেড়াতে যাবার কথা। আবার ঘড়ির দিকে তাকালাম। পৌনে নয়টা বেজে গেছে। ওর আসার কথা সাড়ে আটটায়। এখনো এলো না। বাসা থেকে মাকে বান্ধবীর বাসায় সারাদিন থাকবো বলে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যেই বের হতে যাবো অমনি গেটের কাছে দেখি বড়ভাইয়া দাড়িয়ে আছেন। গোল গোল চোখ করে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছিস। ভয়ে আমার সমস্ত অন্তর কেপে উঠলো। এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম। আজকে বুঝি আর যাওয়া হবে না।

মা এগিয়ে এসে বললেন ওর বান্ধবীর বাড়িতে বেড়াতে যাচেছ। মায়ের সঙ্গে বড়ভাইয়া গজ গজ করে চলে গেল। মাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বললাম, মা, তুমি এতো ভালো কেন।

মা বললেন, হয়েছে, এখন কোথায় যাচ্ছিলি যা আর তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস।

তারপর থেকে বড়ভাইয়ার ওপর খুব রাগ লাগছে। এখন ওর ওপর মেজাজটা চড়ছে। আমি জানি, এই মেজাজ বেশিক্ষণ থাকবে না। ওর হাসি হাসি মুখখানা দেখলেই সব রাগ চলে যাবে।

ওই তো আমার স্বপ্নের নায়ক চলে এসেছে। হলুদ হাওয়াই শার্ট আর জিন্সের স্কিন টাইট আকাশি কালারের প্যান্ট পরেছে। অপূর্ব লাগছে। মুগ্ধ চোখে ওর এগিয়ে আসা দেখছি।

কি বৌ, রেগে আছো?

রেগে থাকার দেখেছো কি। এখন কয়টা বাজে।

কেন সাড়ে আটটা।

সাড়ে আটটা না। দাড়াও তোমার ঘড়িকে আজ আমি বারোটা বাজিয়ে দেবো।

প্লিজ, প্লিজ ছেড়ে দাও। এই ঘড়িটি আমার হবু শাশুড়ি দিয়েছেন। এটা ভেঙে গেলে শাশুড়িমা কষ্ট পাবেন।

ওর কথায় ফিক করে হেসে ফেললাম।

তারপর রিকশায় করে দুজনে বাস স্টপেজে গেলাম। ওখানে গিয়ে ও বললো, চলো, বেবিট্যাকসি করে যাই। ও বেবিট্যাকসি ঠিক করে নিয়ে এলো।

চলতে চলতে দুজনে অনেক কথা বলে ফেললাম। কখন সোনারগাও চলে এসেছি টের পেলাম না। বেবিট্যাকসি থেকে নামলাম।

নামার সঙ্গে সঙ্গে ও আমার হাত ধরে হাটতে থাকে।

বললাম, কি ছেলেমানুষি করছো, ছাড়ো তো।

কেন আমি কি অন্যের বৌয়ের হাত ধরেছি।

না, তা হবে কেন, তুমি তোমার বৌয়ের হাতই ধরেছো। তাই বলে ছোটবাবুর মতো হাত ধরে হাটবে নাকি।

ঠিক আছে ছেড়ে দিলাম। তবে আজ কয়েকটা পাপ্পি খেতে দিতেই হবে।

জি না স্যার এখানে ওসব চলবে না। এই বিখ্যাত জায়গায় এসে তুমি বাদরামো করবে তা হবে না।

একটি গাছের ছায়ায় দুজনে বসলাম। ও নানান রকম গল্প বলে, আমি শুনতে শুনতে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি আর মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভাবতে থাকি।

এই, কি হলো তোমার। তুমি তো কিছু শুনছো না।

হঠাৎ ওর ডাকে সংবিৎ ফিরে পাই। দেখি ও আমার দিকে ফুচকার প্লেট আর কোল্ড ড্রংকস ধরে আছে।

দুজনে মিলে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুরে ঘুরে দেখার জন্য উঠে দাড়ালাম।

হাটতে হাটতে বেশ কিছু দূর আসার পর কিছু দোকান চোখে পড়লো।

বিভিন্ন জিনিস দোকানগুলোতে সাজানো। মাটির শো-পিস গহনা-জামদানি শাড়ি, তাতের শাড়ি, চটের ব্যাগ আরো কতো কি।

আমি একটি দোকানে ঢুকে তাতের শাড়ি দেখছি। দেখতে দেখতে কালো সেডের একটি শাড়ি পছন্দ হলো। পেছনে তাকিয়ে দেখি ও একটু দূরে দাড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে।

চোখে ইশারা করলাম কাছে আসার জন্য। এগিয়ে এলে বললাম, দেখ তো, তাতের এই শাড়িটি আমি কিনবো, কেমন হবে। বলো না, প্লিজ!

আমার সোনাবৌ যা পরে তাই মানায়। তাই দেখতে হবে না, কিনে ফেলো।

আমি ব্যাগ থেকে টাকা বের করে দিচ্ছি আর ও আমার হাত ধরে বললো, ছিঃ, সোনাবৌ আমি থাকতে তুমি টাকা দিচ্ছো কেন।

তিনশ টাকা দিয়ে ও আমাকে কালো শেডের তাতের শাড়িটি কিনে দিল।

আজ দুই বছর হতে চললো ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। কতো দামি এবং সুন্দর শাড়ি যে ও আমাকে কিনে দেয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে আপনার প্রিয় শাড়ি কোনটি? তাহলে আমি সেই তিনশ টাকা দামের কালো শেডের তাতের শাড়িটিই দেখাবো। সেই শাড়িটি কেন আমার এতো প্রিয় জানি না, জানতে চাইও না। ইস্ত্রি করতে গিয়ে শাড়ির খানিকটা পুড়ে গেছে। তাতে কি। প্রিয় শাড়ির তালিকায় সেই শাড়িটি আছে এবং থাকবে।

মালিবাগ, ঢাকা থেকে

মেকআপ

– মাসুম কামাল

সৃজনশীল চলচ্চিত্রের ওপর আমার আগ্রহ চিরন্তন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম এটি একটি গৎবাধা টেকনিকাল সাবজেক্ট। টেলিভিশন তথা পত্রপত্রিকার বিনোদন পাতায় চোখ যায় না এ রকম লোক কমই আছেন।

১৯৯৮ সালে পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপন দেখে ভাবলাম, এতোদিনে বুঝি আমার সিনেমা বানানোর শখ পূরণ হবে। সিদ্ধান্ত মতো ফিল্ম ইন্সটিটিউটে ভর্তি হয়ে গেলাম।

ক্লাসে হাজির হয়ে জানতে পারলাম, আজকের বিষয় মেকআপ। সামাদ স্যার উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশে করে বললেন, আজকে তোমাদের পড়ানো হবে ড্রেসের সঙ্গে মিলিয়ে কিভাবে মেকআপ করা হয় সেটা। এ বিষয়ে তথ্য দিতে এসেছেন এফডিসির মেকআপম্যান। যথারীতি সহপাঠী খালেদকে মডেল করে মেকআপ দেয়া হচ্ছে এবং মেকআপের কার্যকারিতা সম্পর্কে নানান তথ্যও দেয়া হচ্ছে।

এক সময় চা বিরতি পড়লো। ব্যক্তিগত আগ্রহে মেকআপম্যানের সঙ্গে আলাপ করছিলাম। এক সহপাঠী রুবাইয়াৎ ফেরদৌস তাকে উদ্দেশ্য করে বললো, আচ্ছা, এতো পেশা থাকতে আপনি এ পেশায় কেন এলেন?

মেকআপম্যানের তাৎক্ষণিক উত্তর, শাড়ির ভাজে নায়িকার বুকে মেকআপ করার কি যে সুখ তা আপনি বুঝবেন না।

ঢাকা থেকে

রোবট নয়

– সানতা রহমান

অমি ও আমার সম্পর্ক অনেক দিনের। তবে অমির স্বভাব অন্য সবার চেয়ে একটু আলাদা। কেমন যেন রোবট ভাব। তুমি চাইলেই চাদের বুকে বানাবো বাড়ি এ রকম টাইপ প্রেমিক নয়। মাঝে মাঝে আমার খুব বিরক্ত লাগে এই রোবট ভাব দেখে। তবে ভালো লাগে তার উদাসীনতা।

এবার ভালোবাসা দিবসে তার পাঠানো কুরিয়ার ব্যাগ খুলে খুবই অবাক হয়েছি। আমার জন্য অমি সুন্দর একটা টাঙ্গাইলের সুতি শাড়ি পাঠিয়েছে। শাড়িটার দিকে যতোবার আমার চোখ পড়ে, আমার বুকের ভেতর ভালোলাগার ধোয়া ওড়ে এবং অমির মুখটা ভেসে ওঠে। না তো, সেটা রোবট অমি নয়!

তার দেয়া জীবনের প্রথম উপহার শাড়িটা আমার বিয়ের শাড়ি হিসেবে রেখে দিয়েছি। এটা অবশ্যই আমার বিয়ের রাতে পড়বো। দোয়া করবেন যেন আমাদের বিয়েটা হয়।

চট্টগ্রাম থেকে

অন্ধকার রাতে

পরিবারের জুনিয়র সদস্য হওয়ায় ছোটবেলা থেকেই খুব নিয়মের মধ্যে চলতে হতো। যদি কোনো অন্যায় কাজ করি তাহলে আর যায় কোথায়? বিচার কাজ চলতো জজ কোর্ট, হাই কোর্ট হয়ে সুপৃম কোর্ট পর্যন্ত। অর্থাৎ ভাইবোন হয়ে আব্বা–আম্মা পর্যন্ত। তাই পারিবারিক অনুশাসনের ভয়ে প্রায় সব সময়ই সতর্ক থাকতে হতো।

পাচ ফিট নয় ইঞ্চি উচ্চতার আকর্ষণীয় চেহারা, স্মার্ট, ক্লাসের ভালো ছাত্র, সর্বোপরি আর্থিক অবস্থা এই এলাকার মধ্যে অত্যন্ত ভালো। এরপরও কোনো প্রেম করতে পারিনি। এমন না যে, প্রেম করার মতো আমার মন নেই বা আমার চারিত্রিক অবস্থা ভালো না। গত এগারো বারো বছরে অর্থাৎ ক্লাস নাইন–এ উঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমার নামে আমাদের বাড়িতে একটি অভিযোগও আসেনি। তারপর আমি একজন ধূমপানমুক্ত যুবক। পারিবারিক অনুশাসনের জন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে যেচে কোনো সময় কথা বলিনি। তবে মেয়েদের প্রতি আমার খুব টান ছিল। এক ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কলেজ পড়ুয়া মেয়ে এক নাগাড়ে তেতাল্লিশটি চিঠি দিয়েছিল। আমি সাড়া দিইনি। এছাড়াও প্রায়ই প্রেমের প্রস্তাব পেতাম কলেজ জীবনের প্রথম দিকে আত্মীয়ের বাসায়। তারপর মেস–এ উঠি।

কিন্তু ময়মনসিংহ শহরের মেসের পরিবেশ খুব একটা ভালো না। যেমন পানি সঙ্কট, কাজের বুয়ার ঘন ঘন কাজে না আসা, কমন বাথ, ছোট ছোট রুমে বেশ কয়েকজনের এক সঙ্গে থাকা ইত্যাদি বহুবিদ কারণে মেস জীবনে হাফিয়ে উঠি। তাই অনেক খোজ করে এক বড় কর্মকর্তার সরকারি বাসায় সাবলেটে উঠে পড়ি। কিছুদিনের মধ্যে তারা আমাকে আপন করে নিলেন এবং আমার সব বিষয়ে খোজ–খবর নিতেন। অমিভাবীও (আমার দেয়া নাম) আমার খবরা খবর নিতেন। ওনাদের চার বছরের একমাত্র ছেলেটি আমার নামে পাগল ছিল। প্রায় রাতেই আসার কাছে ঘুমিয়ে পড়তো তারপর ভাবী এসে নিয়ে যেতেন।

এভাবেই পারিবারিক পরিবেশে দিনগুলো কাটতে লাগলো।

কিছুদিন পর ভদ্রলোক কয়েক মাসের ট্রেনিংয়ে বিদেশে চলে যান। ওদের দেখাশোনার দায়িত্ব আমার ওপর দিয়ে যান। ওনার ছেলেটি সারাক্ষণ আমার সঙ্গে সুপার গ্লু–র মতো লেগে থাকতো এবং আমার কাছেই ঘুমাতো। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভাবী যখন নুয়ে পড়ে বাবুকে কোলে নিতেন তখন ওনার গা থেকে শাড়ি পড়ে যেতো এবং ওনার সমস্ত বুক ব্লাউজের ফাক দিয়ে দেখা যেতো। বাবুকে কোলে নেয়ার পর মাঝে মধ্যে শাড়িটা তুলে দেয়ার জন্য বলতেন। কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে শাড়িটা তুলে দিতাম।

হঠাৎ একদিন রাতে বিদ্যুৎ চলে যায়। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, অন্ধকারে তো আর পড়তে পারবে না। এখানে এসে বসো। হাত পাখা দিয়ে আমি বাতাস করি আর গল্প করি।

ভাবী হেলান দিয়ে খাটের ওপর বসলেন। আমি ওনার পায়ের দিকে বসলাম।
তিনি বললেন, তুমি পাশে এসে বসো, তোমার শরীরে তো বাতাস লাগে না। না করার পরও তিনি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে ওনার পাশে বসালেন। একটু দূরত্ব রেখে বসলাম।
তিনি বললেন, আরে, গায়ে গা লাগিয়ে বসো, তোমার ভালো লাগবে।
আমার শরীরে ফুলহাতা জামা ছিল।
গরমে তুমি এতো কাপড় পরেছো কেন? আমার শরীরে হাত দিয়ে দেখো শুধু শাড়িটা উপরে দিয়ে রেখেছি।
ভাবীর এই কথা শুনে অন্ধকারে আমি থ হয়ে গেলাম। তখন তিনি আমার একটি হাত টেনে নিয়ে ওনার খোলা বুকের ওপর রাখলেন শাড়িটা সরিয়ে। বাইশটি বসন্ত পেরিয়ে আসা এই যুবকটি বাইশ হাজার ভোল্টের একটি শক খেল আপাদমস্তক। ভাবী শিখিয়ে দিলেন কিভাবে ভালোবাসতে হয়। শুরু করে দিলাম। ভাবীর মুখ দিয়ে আনন্দ ধ্বনি বের হতে লাগলো। মনে হলো আমি যেন কলাম্বাসের মতো নতুন কোনো দেশ আবিষ্কার করে ফেলেছি। আর সেই দেশ দখল করার জন্য যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছি। দেশ স্বাধীন করে এক সময় যুদ্ধ শেষ হলো।
এরপর যখনই মন চাইতো তখনই মিলিত হতাম ভদ্রলোক দেশে না আসা পর্যন্ত। তিনি দেশে আসার পর সুন্দর পরিবেশের মধ্য দিয়ে চলে আসি বাসা থেকে। বছরে দুই একবার বাসায় যাই। ওই কাজটি আর হয়ে ওঠে না সুযোগের জন্য। এখনো অন্ধকার রাতে বিদ্যুৎ চলে গেলে ভাবীর কথা মনে পড়ে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা থেকে

চাওয়া–পাওয়া

প্রতিদিন নছিরনের সঙ্গে বাবলার বাবার ঝগড়া হয় একটা ভালো শাড়ি কিনে দেয়ার জন্য। একটা ভালো শাড়ি কিনে দেয়ার মতো সচ্ছলতা হয়তো মানুষটার হতো যদি সে বর্তমান চাকরিটাতে স্থায়ী হতো। গ্যাস ফিল্ডের চাকরিটা স্থায়ী হলে লভ্যাংশ ও ওভারটাইম মিলে যা আসতো তা দিয়ে বেতনের টাকা ছাড়া নছিরনদের ভালোভাবেই চলে যেতো। নছিরন ভাবে আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।
একটা ভালো ফুল ফুল ছাপা শাড়ির খুবই শখ নছিরনের। গেল ঈদে পাশের বাসার টিয়ার মা পঞ্চাশের কোঠাতেও যেভাবে রঙ–ঢঙ করে নতুন শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ালো তা দেখে আটাশ বছরের নছিরনের শখই বা জাগবে না কেন? তাই এবার সে ঠিক করেছে কম্পানির ডাক্তারের বাসায় ঠিকা ঝি–এর কাজটা সে নেবেই। অনেক দিন থেকেই ডাক্তার সাহেব তার বাসায় কাজ করে দেয়ার জন্য বলে আসছিল। বাবলার অযত্ন হবে ভেবেই সে এতো দিন কাজ করতে সম্মত হয়নি। এভাবে কতোদিন সে ছেলের কথা ভেবে নিজের দিকে তাকানোর কথা ভুলে থাকবে। তাই সে ঠিক করেছে ডাক্তার সাহেবের বাসায় কাজ করে যে টাকাটা পাবে তা দিয়েই তার সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত শাড়িটা কিনবে।

ডাক্তার সাহেবের বৌও ডাক্তার। ঢাকাতে পড়াশোনা করে আরো বড় ডাক্তার হওয়ার জন্য। ডাক্তার সাহেবের দুই ছেলের মধ্যে বড়টা থাকে তার সঙ্গে আর ছোটটা থাকে মায়ের সঙ্গে। ডাক্তার সাহেব লোকটা ভালোই। চৌধুরী বংশের ছেলে বলে কথা! প্রথম প্রথম বাবলাকে সঙ্গে করে কাজে আসতো নছিরন। পরে বাবলাকে ডাক্তার সাহেবের উৎসাহে পাশের হরিপুর স্কুলে ভর্তি করে দেয়ার পর নছিরন একাই আসে কাজে। ভালোই কাটছিল নছিরনের নতুন কাজের মাঝে ডুবে। এভাবে একদিন মাসও শেষ হয়ে যায়। কড়কড়ে নতুন টাকা দিয়ে ডাক্তার সাহেব তার বেতন পরিশোধ করেন। উপরন্তু বখশিশও দেন। নিজের জীবনের প্রথম উপার্জনের টাকা! অদ্ভুত এক আনন্দে বিমোহিত হয়ে নছিরন ছুটে যায় বাবলার বাবার কাছে। বিকেলে সিলেট শহরে যায় তারা তিনজন নছিরন, বাবলা ও বাবলার বাবা খরচপাতি করার জন্য। বাবলার বাবার লুঙ্গি, বাবলার স্কুলে যাবার জুতা এবং নছিরনের সেই স্বপ্নের শাড়ি!

পরের দিন নছিরন সেই ফুল ফুল ছাপা শাড়ি পরে কাজে যায়। ডাক্তার সাহেব দরজা খুলে দিয়েই যেন থমকে দাড়ান। নছিরনের মনে হয় মানুষটা যেন কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার সেই তাকানোতে নারী মনে কি একটু বিপদের ছায়া পড়লো? না। ডাক্তার মানুষটা অমন না ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে কাজের মাঝে ঝাপিয়ে পড়লো নছিরন। আপন মনে ড্রয়িংরুমের মেঝে পরিষ্কার করতে করতে হঠাৎ নছিনর উপলব্ধি করলো তার শাড়ির আচলে কিসের যেন টান পড়লো। বহু কষ্টের শাড়ির আচল ছিড়ে যাবার ভয়ে চোখ বন্ধ করে থাকলো সে।

কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে নছিরন দেখে শাড়ির অর্ধেক তার শরীর থেকে খুলে ডাক্তার সাহেবের হাতে ঝুলছে।

সে ছিঃ বলে অন্য ঘরে চলে যেতেই বলিষ্ঠ হাতে ডাক্তার সাহেব তাকে ধরে ফেললো। সে যতোই নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে ততোই যেন ডাক্তার সাহেবের হাতের বাধন শক্ত হয়ে অক্টোপাসের মতো তাকে পিষ্ট করে চলেছে। নছিরন চিৎকার দিয়ে নিজেকে আত্মরক্ষার বৃথা চেষ্টা করলো। ততোক্ষণে ডাক্তার সাহেব তার মুখে সোফার ব্যাক কভার গুজে দিয়েছে। ধীরে ধীরে নছিরন নিস্তেজ হয়ে আসে ডাক্তারের পাশবিক প্রবল চাপে। সে উপলব্ধি করে ডাক্তার তার ওপর উপগত হয়ে আদিম ও বন্য হয়ে উঠেছে।

এক সময় ডাক্তার এলিয়ে পড়ে তার ওপর। নছিরন তার ঋতুচক্রের এই বিপদজনক সময়ে নিজের ওপর এলিয়ে পড়া ডাক্তার সাহেবের মুখে থুথু ছিটিয়ে দিয়ে শাড়িটা নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে আসে বাসায়। সমস্ত কিছুর জন্য সে ফুল ফুল ছাপা শাড়িটাকেই দায়ী করে। কাঠের ঘুন পোকা মারার জন্য আনা কেরোসিন সে শাড়িটার ওপর ছিটিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে ফুল ফুল ছাপা সুতির শাড়িটা। নছিরন সেই প্রজ্জ্বলিত শিখার মধ্যে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সে ভাবতে থাকে এভাবে যদি ডাক্তার নামের লম্পটটাকে সে পোড়াতে পারতো।

নাম ঠিকানাবিহীন

লোভ

– নাসিমা জাহান নীরু

বছর পাচেক আগে আমার বাড়ির দুটো বাড়ি পরেই স্বামী–স্ত্রী এবং দুই বছর বয়সের সন্তানসহ এক পরিবার ভাড়া এলেন। রাস্তায় যাওয়া–আসা বা বিকেলে হাটার সুবাদে ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভীষণ ঘনিষ্ঠ আকার ধারণ করলো। দুই পরিবারের মধ্যে ভালো কিছু রান্না হলেই দেয়া–নেয়া হতো। ঈদের বাজার। টুকটাক কেনাকাটা ইত্যাদি আমরা দুজন একই সঙ্গে করতাম। এবং দুজনের বাসায় যাতায়াত ছিল অবাধ।

একদিন দুপুরে ভীষণ মাথা ধরেছে। শুয়েছিলাম। হঠাৎ দরজায় নক হলো। খুলে দেখলাম মিশুর মা। আমার মাথা ব্যথা দেখে সে টিপে দেয়ার জন্য জেদ ধরলেন। আমি এতো নিষেধ করলাম, কিছুতেই শুনলেন না। মাথা টিপে দেয়াতে ভীষণ আরাম বোধ করলাম। ভীষণ ক্লান্ত থাকায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙলো প্রায় সন্ধ্যা হয় এমন সময়। চট করে উঠে দেখি ঘরের দরজা ভেজানো। অন্য ঘরে যে যার মতো আছে। বুঝলাম ঘুমিয়ে পড়াতে মিশুর মা আর ডাকেনি আমাকে। চলে যাবার সময় দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

উঠান থেকে কাপড় তুলতে গিয়ে দেখি আমার শাড়িটা নেই। এমনি, বাংলাদেশি নরমাল শাড়ি। কিন্তু একদম নতুন। দিন পনেরো আগে আমি আর মিশুর মা এক সঙ্গে গিয়ে কিনে এনেছিলাম। ভীষণ খোজাখুজি করলাম। শাড়িটা একদম লাপাত্তা হয়ে গেল। মিশুর মা শুনেও ভীষণ আফসোস করতে লাগলেন শাড়িটার জন্য। আস্তে আস্তে শাড়ি হারানোর ব্যাপারটা ভুলে গেলাম। কিছুদিন পর মিশুর মা অন্য জায়গায় ভাড়া চলে গেলেন। এরপর আর মিশুর মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি বহুদিন।

এ বছর জানুয়ারিতে আমার বাচ্চাকে স্কুলে ভর্তি করার জন্য কাছের স্কুলগুলোতে চান্স না পেয়ে একটু দূরের এক কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করার জন্য ভর্তি ফরম তুলতে গিয়ে হঠাৎ এক মহিলা পেছন থেকে ভাবী বলে উঠলেন। আমি পেছন ফিরে দেখি মিশুর মা। সেও এসেছে ফরম তুলতে। শুনলাম স্কুলের পাশেই তার বাসা। এতো দূরে কেন এসেছি বলতেই বললাম, কাছের স্কুলগুলোতে সুযোগ পেল না তাই।

কথায় কথায় এক রকম জোর করেই আমাকে তার বাসায় নিয়ে গেলেন। দেখলাম বাসাটা ভীষণ সুন্দর, ভাড়াও বেশি। আমাকে এক ঘরে বসিয়ে রেখে বললেন, ভাবী, একটু বসুন আমি কাপড় চেঞ্জ করে আসি।

মিশুর মা আসতে দেরি করছে দেখে আগের মতোই এক ঘর থেকে আরেক ঘরে তাকে খুজতে লাগলাম। হঠাৎ বিছানায় চোখ যেতেই একটা কাথা দেখলাম। একটু থমকালাম। কাছে গিয়ে কাথার একটা ভাজ খুলেই একবারে শিওর হয়ে গেলাম, কাথাটা আমার সেই পাচ বছর আগের হারিয়ে যাওয়া শাড়িটা দিয়ে তৈরি। আমি যেন কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। সামান্য একটা সুতি শাড়ির লোভ মিশুর মা সামলাতে পারেননি, তিনি চুরি করেছিলেন শাড়িটা!

আমার শুধু সেই স্মৃতিগুলো ভেসে এলো চোখের সামনে। শাড়ি হারিয়ে যাবার কথা শুনে মিশুর মায়ের সেই আফসোস মাখা চেহারাটা আমার মনে পড়ছে। কতোক্ষণ এভাবে দাড়িয়েছিলাম জানি না।

হঠাৎ মিশুর মায়ের গলা শুনলাম, ভাবী, আপনি এ ঘরে আর আপনাকে আমি খুজছি ও ঘরে, বলেই মিশুর মা থমকে গেলেন আমার হাতে ভাজ খোলা কাথাটা দেখে।

আমি শুধু মিশুর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলতে পেরেছিলাম, ছিঃ মিশুর মা, এমন একটা কাজ আপনি করতে পেরেছিলেন!

তাৎক্ষণিক সেই বাসা থেকে চলে এসেছিলাম একটা বিশ্বাস ভাঙা তিক্ত মন নিয়ে মিশুর মায়ের পিছু ডাককে উপেক্ষা করে।

তালাইমারী, রাজশাহী থেকে

রূপা কাহিনী

– রাজিব ফেরদৌস

আমার অতি আদরের বোনটির নাম ছিল রূপা। শুধু আমার নয়, বাবা-মাও তাকে খুব ভালোবাসতেন। সে ছিল মানসিকভাবে অসুস্থ। ডাক্তার বলতেন তাকে সব সময় আদর, স্নেহ আর ভালোবাসার বন্ধনে জড়িয়ে রাখতে। আমরা তাই রাখতাম। শাড়ির প্রতি তার ছিল প্রচণ্ড রকমের আগ্রহ। যৌবনে পা রাখার পর তার শাড়ির প্রতি দুর্বলতা আরো বেড়ে গেল। সারাক্ষণ শাড়ি পরে থাকতে ভালোবাসতো সে। আমার মায়ের তুলে রাখার মতো শাড়ি ছিল মাত্র একটা। বাবা সামান্য বেতনের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। সংসার দেখাশোনার পর আমাদের কারো শখ-আহ্লাদ মেটানোর সাধ্য তার হতো না। এর জন্য বাবা মায়ের কাছে প্রায়ই অনুশোচনা করতেন। মা তাকে সান্ত্বনা দিতেন। বলতেন, আমাদের রাজিব আছে না? সে বড় হয়ে আমাদের সুখী করবে, তুমি দেখে নিও।

আমি বড় হচ্ছিলাম। কলেজেও পা রেখেছিলাম। আর মনে মনে ভাবতাম, আমাকে বড় হওয়ার মধ্য দিয়ে বড় হতে হবে। বাবা মাকে সুখী করতে হবে। আমার একমাত্র আদরের বোন রূপার চিকিৎসা করাতে হবে। এসব যেন রেকর্ডের মতো সব সময় আমার কানে বাজতো। রূপা শাড়ি পরে সেজেগুজে আমার পড়ার ঘরে এসে গদ গদ হয়ে বলতো, দেখো তো ভাই, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে? নতুন বৌ-এর মতো না?

আমি এবং সে ছিলাম পিঠাপিঠি। তবুও সে আমাকে বড় ভাই হিসেবেই জানতো। আমি তার দিকে তাকাতাম। তাকে শাড়িতে অসম্ভব সুন্দর দেখাতো। সে সৌন্দর্যের কথা ভাষায় প্রকাশ করতে পারতাম না। কেবল মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। তার পরনের শাড়ি দেখে বুঝতে পারতাম পাশের বাড়ির নাহারভাবীর শাড়ি ওটা। নাহারভাবী তাকে খুব ভালোবাসতেন। নতুন নতুন শাড়ি দিতেন পরতে। তবুও আমরা তাকে এই বাড়িতে যেতে দিতে একটু ইতস্তত করতাম। নাহারভাবীর দেবরের নাম আফছার। তিনিও রূপাকে ভালোবাসতেন। আর আমাদের ভয়টা হতো সে জন্যই। কারণ লোক হিসেবে আফসারভাই খুব একটা সুবিধার ছিলেন না।

এক গ্রীষ্মের বিকেলে বাবা স্কুল থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে বারান্দায় মোড়া পেতে বসলেন। মা পাখা হাতে পাশে বসে বাতাস করছিলেন। এই সময় রূপা নতুন একটা শাড়ি এনে খুশিতে গদ গদ হয়ে ছোট্ট

খুকির মতো বললো, মা, এই শাড়িটা আমাকে আফসারভাই দিয়েছেন। তিনি আমাকে চুমুও খেয়েছেন। জানো মা, আফছার বললেন, চুমু খেতে দিলে তিনি নাকি আমাকে নতুন নতুন শাড়ি কিনে দেবেন। কি মজা, তাই না মা?

রাগ চরম মাত্রায় উঠলে বাবার ফর্শা মুখ নীলচে হয়ে যায়। তিনি সম্ভবত নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। মোড়া থেকে উঠে রূপার হাত থেকে একটানে শাড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে উঠানে ছুড়ে মারলেন। তারপর যন্ত্রের মতো তাকে মারতে থাকলেন। রূপা কাদছিল না। তবে তার মুখ দিয়ে ফিসফিস করে কথা বের হচ্ছিল।

আমাকে মারছো কেন? বাবা, মারছো কেন? বাবা মারছো কেন মা? আমি কি করলাম? ব্যথা লাগে তো।

বাবা তাকে ঘরে তালাবন্দী করলেন। আমি জানালা দিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতাম। সে আমাকে দেখে ছোট্ট শিশুর মতো কাদতো। ভাই, আমাকে আটকে রাখছিস কেন? আমি কি পশু? আমি তো মানুষ। আমার শাড়ি পরতে ইচ্ছা করছে। আমাকে একটি শাড়ি দিয়ে যা। মায়ের শাড়িটাই না হয় দিয়ে যা। আমি কথা বলতে পারতাম না। আকাশের দিকে তাকাতাম। চোখ দিয়ে পানি এসে পড়তো। অনেক চেষ্টা করতাম পানি না ফেলতে।

আটদিন পর এক সন্ধ্যায় বাবা রূপার জন্য নতুন একটি শাড়ি কিনে এনে তালা খুললেন। শাড়ি দেখে তার সারা চোখে–মুখে আনন্দের ঝিলিক খেলে গেল। শাড়ি পরে সারা উঠান ধেই ধেই করে নেচে বেড়াতো। বাবা নীরবে চোখের জল ফেলতেন। রূপাকে যতোবার দেখছিলাম ততোবারই মুগ্ধ হচ্ছিলাম। এতো রূপবতী বোন আমার।

সেদিন ছিল মঙ্গলবার। বিকেলে চা খাওয়া ছিল বাবার নিয়মিত অভ্যাস। মা অসুস্থতার কারণে চা করে দিতে পারলেন না। বাবা বিরস মুখে বারান্দায় বসেছিলেন। রূপা কোনোভাবে তা বুঝতে পারলো। চা করার জন্য নিজেই সে রান্না ঘরে গেল। কিছুক্ষণ পর রান্না ঘর থেকে রূপার ভয়ার্ত চিৎকার শুনে ছুটে গেলাম আমি আর বাবা। গিয়ে যা দেখলাম তা খুব ভালোভাবে গুছিয়ে লিখতে পারবো না। তবে চোখ বুজলেই সে দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দেখতে পাই রূপার অপরূপ দেহটা আগুনে পুড়ে কি বীভৎস, কি কুৎসিত দেখাচ্ছে। তার গায়ের নতুন শাড়িটিতে তখনো ধিক ধিক করে আগুন জ্বলছে।

অবর্ণনীয় এক কষ্ট থেকে রূপা রেহাই পেল। সে মারা গেল রাত আটটায়। আমি এতো শোক সহ্য করতে পারলাম না। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে বেরিয়ে অবাক হয়ে গেলাম! এতো সুন্দর জ্যোৎস্না জীবনে দেখিনি। কিংবা হয়তো দেখেছি কিন্তু আজকের মতো এতো সুন্দর লাগেনি। আমি সামনের দিকে হাটতে থাকলাম।

বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ থেকে

আগুন

– জুয়েল

সেই থেকে আর ছাদে উঠি না। দেখি না সূর্যাস্ত কিংবা সুন্দর বিকেল। কারো উপস্থিতিই ভালো লাগে না। সব কিছুর মাঝেই অবসাদ। কোনো কিছুতেই এখন সুন্দরকে খুজে পাই না। সব কিছুকেই কেমন যেন অসুন্দর ও কলুষ মনে হয়। আবার ভাবি, তা কি করে হয়, সুন্দর তো সুন্দরই। হয়তো আমি তাকে দেখতে পাই না। পারি না খুজতে কিংবা স্পর্শ করতে। অথচ এক সময় কি না সব কিছুর মাঝেই সুন্দরকে খুজে ফিরতাম।

এখন কারো অট্টহাসি আমাকে অবাক করে রাগিয়ে দেয় প্রচণ্ড। ভালো লাগে নীরবতা, পিনপতন নীরবতা। বাতি নিভিয়ে অন্ধকারে শুয়ে থাকি সারাক্ষণ। বিদ্যুৎ–এর অনুপস্থিতি স্বস্তি দেয়। মশার কামড়ও সয়ে গেছে। দিনে দিনে কেমন জড় আর অসাড় হয়ে গিয়েছে। নিজেকে নিয়ে ভাবি না, ভাবতে চাই না। কারণ আমার ভাবনার সবটুকু জুড়েই নীলা।

নীলা আমার খালাতো বোন। আমাদের উভয়ের বাড়ি এতো পাশাপাশি যে, এক ছাদ থেকে অন্য ছাদে সহজেই যাওয়া যায়। সেই জন্মলগ্ন থেকে দেখে আসছি দুই পরিবারের মধ্যে ভয়ঙ্কর এক দ্বন্দ্ব। আজ আর সেই দ্বন্দ্বের কারণটি বলতে লজ্জা কিংবা দ্বিধা নেই। তাদের এবং আমাদের বাড়ি নানার সম্পত্তি। নানার আট কাঠা জমির মধ্যে ছোট এবং আদরের বলে আমার মাকে পাচ কাঠা এবং নীলার মাকে (বড়খালা) তিন কাঠা জমি দিয়েছিলেন। এ থেকেই বড়খালার জোর আপত্তি এক তুমুল দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছে। এ দ্বন্দ্বে দণ্ডিত হলাম আমি, নীলা এবং আমাদের ভালোবাসা।

নীলা খুবই বাস্তববাদী মেয়ে। সে বলতো, ভালোবাসাই আবেগ, আবেগ ছাড়া ভালোবাসা হয় না। তাই বলে আমাদের ভালোবাসায় কোনো আবেগকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না, বাস্তবতা সামলে চলতে হবে দুজনকেই।

আমাদের ভালোবাসার এই চার বছরে তার সঙ্গে যতো কথাই হয়েছে তার বেশির ভাগই হতো উভয় পরিবারের দ্বন্দ্ব নিয়ে কথা। কারণ এ দ্বন্দ্বই আমাদের ভালোবাসার প্রথম, প্রধান ও বড় বাধা।

যাই হোক, সেদিন এই দ্বন্দ্বের সমাধান খুজতে যখন আর কিছু পেলাম না, নীলা হঠাৎ করেই বলে বসলো, চল, বিয়ে করে ফেলি।

বললাম, তাতে কি আবেগের প্রশ্রয় দেয়া হবে না!

বললো, এতো কিছু ভাবার সময় আমার হাতে নেই।

যেই কথা সেই কাজ। আমার তো ভয়েই পা ঠক ঠক করছিল বিয়ের পরবর্তী দুই পরিবারের প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে। কিভাবে? কোথায় গিয়ে বিয়ে করবো? কেউ যদি দেখে ফেলে?

অবশেষে বন্ধু লাভলু বললো, এতো বেশি চিন্তা করিস না। আমার এক পরিচিত কাজি আছে, তার বাড়িতে বসে বিশেষভাবে এসব বিয়ে পড়ানো হয়। সব কিছুই গোপন রাখবে। আর নীলা, তুমি বিকাল পাচটার মধ্যেই চলে এসো। এবার চল, একটা শাড়ি কিনে আনতে হবে। পকেটে টাকা পয়সা আছে তো?

বললাম, তেমন তো নেই। শাড়ি দিয়ে কি হবে।

বললো, গাধা, বলছে শাড়ি দিয়ে কি হবে। আবার বিয়েও করার শখ হয়েছে। চল, টাকা আমার কাছে আছে। আর নীলা, সময় মতো চলে এসো কিন্তু।

ব্যস, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমরা তিনজন কাজি বাড়ি পৌছালাম। নীলার পরনে আমার কেনা বিয়ের প্রথম শাড়িটা। অপূর্ব লাগছে নীলাকে।

বারান্দায় কিছুক্ষণ বসার পর কাজি আসলেন। বললেন, আপনারা এতো দেরি করলেন কেন? আপনাদের জন্য এতোক্ষণ অপেক্ষা করে ভেতরে বসে আরেকটা বিয়ে পড়ানো শুরু করেছি কেবল। তারা পাচ ছয়জন মিলে তাদের দুই বন্ধু-বান্ধবীর বিয়ে দিচ্ছে। খুবই তাড়াতাড়ি করছে। যেহেতু আপনারা আগে বলে রেখেছেন সেহেতু আপনাদের বিয়েটা আগে পড়াতে চাই।

বললাম, দেখুন, কাজি সাহেব বিয়ে জীবনে পাচবার আসে না। আমার একটি মাত্র বিয়ে, একটু নির্ঞ্ঝাটভাবে পড়ালেই খুশি হই। আপনি বরং ভেতরের পার্টিকে আগে বিদায় করুন।

আচ্ছা আপনাদের যা ইচ্ছা। বলেই কাজি সাহেব ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে কাজি আবার এলেন। বললেন, আপনারাও ভেতরে আসুন, তাদের বিয়েটা আগে পড়ানো অনুমতি দেয়ার এরা খুশি হয়েছে। তারা আপনাদের ডাকছে।

বললাম, না থাক, আমরা এখানেই বসি।

কাজি সাহেব আচ্ছা বলে ভেতরে যেতেই কে একজন যেন বারান্দায় আমাদের ডাকতে এলো আর বললো, কি হলো? আসুন না ভাই...।

কণ্ঠস্বরটি শুনেই চমকে গিয়ে নীলা উঠে দাড়ালো। সে বারান্দায় আসতেই আমিও চমকে না উঠে পারলাম না। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কারণ এ যে আমাদের শুভ! নীলার ছোট ভাই।

পরক্ষণে আমি শুধু শুভর কণ্ঠে শুনলাম – আপু বাড়ি চলো।

লাভলুকে বললাম, আমাকেও বাড়িতে দিয়ে আয়। আসার পথে নিজেকে খুব নিঃস্ব মনে হলো। সারা পৃথিবীকে মনে হলো ওলট-পালট। স্থির হয়ে বসেছিলাম।

বাড়ি এসে বসতেই বড়খালার আগমন দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, কোথায় মরিয়ম? আর কতো ষড়যন্ত্র করবি। ইত্যাদি।

আমি দ্রুত লজ্জা আর ভয়ে ছাদে উঠে গেলাম। বড়খালার চেচামেচিতে প্রতিবেশীরা বাসার ভেতরে চলে এসেছে। সেই বিশ্রী সময়টা এবং সেই বিশ্রী অনুভূতি প্রকাশ করার ভাষা আমার জানা নেই। দুই চোখ চেপে ধরে ছাদে বসে পড়লাম।

হঠাৎ শুভর চিৎকার-চেচামেচি শুনতে পেলাম। বুঝলাম শুভ তাদের ছাদে উঠেছে। ছাদের লাইটের আলোতে শুভকে দেখা গেল। আরো দেখা গেল শুভর হাতে নীলার পরনের আমার কেনা বিয়ের প্রথম শাড়িটা। অন্য হাতে একটা ম্যাচ লাইট।

শুভ চিৎকার করছে আর বলছে, ইউ রাস্কেল, বিয়ের শখ হয়েছে!

বলেই আমার চোখের সামনে শাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দিল। সন্ধ্যা রাতের অন্ধকারকে আলোকিত করে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আমার জীবনের প্রথম কেনা বিয়ের শাড়িটা। বাতাসে বাতাসে মিশে যাচ্ছে শাড়ি পোড়া অদ্ভুত এক গন্ধ।

সেদিনের পর থেকে আর কখনো ছাদে উঠিনি। কারণ ছাদে উঠলেই দুই চোখে ভেসে ওঠে দাউ দাউ করে জ্বলন্ত একটি বিয়ের শাড়ি।

ঢাকা থেকে

হেফাজতকারী

– ফরহাদ আহমেদ

১৯৮৮ সাল। দেশব্যাপী স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন। কুলাউড়াবাসীর রেল লাইন, রেল সেতু উৎপাটনের সাড়া জাগানো তীব্র আন্দোলনের কথা বিবিসি এবং ভিওএ–র মাধ্যমে জানতে পেরেছে দেশবাসী। জাতীয় দৈনিকগুলো *আন্দোলনে কুলাউড়া* প্রকৃতির ফার্স্ট লিড নিউজ ছেপেছে।

সর্বদলীয় ছাত্র নেতৃবৃন্দের ওপর মামলা দায়ের হয়েছে। পুলিশি নির্যাতনের ভয়ে থেকেও কুলাউড়ার জসিম, তপন, তোফায়েল, লতিফ, শিপলু, হান্নান, কদরুল, জলিল (অনেকেই ইউনিয়ন চেয়ারম্যানসহ বর্তমানে বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত) প্রমুখ ছাত্র নেতারা তিন দিনের ব্যবধানে দ্বিতীয় দফা অপারেশনে কুলাউড়া শহরতলীর চৌধুরীবাজার সংলগ্ন রেল সেতু সন্ধ্যার পর তুলে ফেলে। ফলে বাজার থেকে অদূরবর্তী ছাত্রনেতা জলিলের বাড়িতে সেই রাতের পরজীবী রূপে আশ্রয় নিল সবাই। স্থান সংকুলানের অভাবে বদরুল, হান্নান সৌভাগ্যের ফলে অন্য আরেক বাড়িতে ঠাই পেল। এদিকে সোর্সের মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে মধ্য রাতে এক ট্রাক পুলিশ সেই বাড়িতে হানা দিল। পুলিশের ব্যারিকেড থেকে পালানোর পথ নেই। বাড়িতে অবস্থানরত ছাত্র নেতারা একে একে ধরা পড়ছে। সুচতুর জলিল ত্বরিত গতিতে শাড়ি পরে একটি ছোট্ট বাচ্চাকে কোলে নিয়ে মহিলাদের ভিড়ে মিশে গেল। ফলাফল, শাড়ি পরার বদৌলতে জলিল ছাড়া উল্লিখিত সবাইকে তিন মাস কারাবরণ করতে হলো।

কুলাউড়া থেকে

আনন্দ অশ্রু

– কানন

স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে ডাক্তার হবো। মনের গভীরে এমনি আশা নিয়ে লেখাপড়া করতে লাগলাম। সায়েন্স থেকে ফার্স্ট ডিভিশনে এইচএসসি পাস করেও ডাক্তারিতে পড়ার সুযোগ যখন দুই বছরেও পেলাম না উচ্চ শিক্ষার বাসনা তখন অস্তমিত সূর্যের মতো ডুবতে লাগলো আপন ভুবনে। তারই মাঝে সউদি ফেরত পিতার শূন্য হাত দুইখানা আমার লেখাপড়ার বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরি পাবার নিমিত্তে খোদার দরবারে ফরিয়াদ শুরু করলেন। তার প্রার্থনা সফলতা পেলেও অল্প বেতনে চাকরি নিয়ে তুষ্ট ছিলাম না।

চাকরিতে প্রবেশ করে শিক্ষানবিশ হিসেবে বেশ কিছুদিন ট্রেনিংয়ের পর বাড়ি যাবো। মনে সে কি আনন্দের বন্যা। যেন বর্ষার ভরা যৌবনে পানি উপছে পড়ছে দুই কূল ভরে। সতীর্থরা বাড়ির জন্য জিনিসপত্র কেনার বাসনায় ব্যাকুল হয়ে উঠলো। আমার এক মিতাকে সঙ্গে নিয়ে কিছু কিনতে মার্কেটে

গেলাম। মিতার পছন্দের ভিত্তিতে পাচশ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে মায়ের জন্য একখানা শাড়ি কিনলাম। রুমের সবাই আমাদের রুচির প্রশংসা করেছিল। মনে মনে সে কি আনন্দ! কবে বাড়ি যাবো, প্রহর গুণতে লাগলাম। প্রতীক্ষার প্রহর এমনিতেই শেষ হয় খুব দেরিতে, তার উপর আবার ছুটি হতে সময় তিন দিন বেশি লেগে গেল। তিন তিনটি দিন মনে হয়েছিল যেন তিন মাস। আসলে এটাই মনে হয় ভালোবাসার আরেকটি কাঙ্ক্ষিত রূপ।

অবশেষে বাড়ি গেলাম। সবাই খুশিতে টগবগ করছে। মা তো দুই চোখ দিয়ে ঝরনা বইয়ে দিলেন। হয়তো এটি ছিল তার আনন্দের অশ্রু। বাবার সংসার চালাতে তখন খুব কষ্ট হচ্ছিল। চারদিকে ঋণে আক্রান্ত বাবার প্রশংসনীয় উদার মনটা ঋণের ভারে সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছিল তা পরে বুঝতে পেরেছিলাম।

ছোটদের জন্য পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত থেকে ঝিনুক মালা, কিছু খেলনা কিনেছিলাম তা ব্যাগ থেকে বের করে দিলাম। ব্যাগ থেকে প্যাকেট করা শাড়িটা বের করলাম। আব্বার হাতে দিয়ে বললাম, মায়ের জন্য একখানা শাড়ি। আব্বা একটুখানি ঈষৎ হাসি দিয়ে বললেন, কি দরকার ছিল বাবা।

হাসি মাখা ছোট এই কথাটি আমার মনে খুব লেগেছিল। দুই চোখ থেকে নিজের অজান্তেই যেন লাগামহীন ঘোড়ার মতো অশ্রু ছুটলো একটু মন্থরগতিতে। বুদ্ধিমতী মা কিছুটা আচ করতে পেয়ে আব্বাকে বকেছিলেন। পরে অবশ্য মা-ই আমাকে বলেছিলেন আমাদের যখন সুদিন ছিল আব্বা নাকি কিছুদিন পর পর চার পাচটি করে শাড়ি কাপড় এনে মাকে বলতেন, তোমার যতোগুলো পছন্দ হয় ততোটা রেখে দাও।

বুঝতে বাকি রইলো না, বাবার ভালোবাসা অর্থের কাছে জিম্মি হয়ে গেছে। শাড়িটি পরে তার আচলের নিচে আমাকে জড়িয়ে ধরে মা বলেছিলেন, আমি তোদের কাপড় নয়, তোদেরকে ভালোবাসি।

মায়ের ভালোবাসায় সিক্ত ছেলের সমর্পণে পিতার চোখে আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল।

কাপাসিয়া, গাজীপুর থেকে

ছোট বেহেশত

– মোহাম্মদ কবির হোসেন

আমাদের পরিবারে আমরা তিন ভাই, এক বোন, বাবা ও মা। আমাদের সবার বড় বোন এবার এসএসসি পরীক্ষা দেবে। তার পরের ভাই ক্লাস টেনে, মেজভাই মাদ্রাসায় ক্লাস সেভেনে। আমি প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস ফোরে। বাবা সরকারি ফুড অফিসের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। আমাদের সবার পড়ালেখার খরচ, সংসারের খরচ চালিয়ে নিতে বাবা প্রায়ই হিমশিম খেতেন। প্রতি মাসেই ধার-দেনা করতে হতো।

বোন বড় হয়েছে, তার বিয়ে প্রয়োজন। দুই চারটে সম্বন্ধ অবশ্য এরই মধ্যে এসেছে। তারই মধ্যে থেকে পাত্র নিজেই আমার বোনকে পছন্দ করলো। মুরুব্বিরা আলাপ সেরে বিয়ের দিন-ক্ষণ ঠিক

করলো। ছেলেপক্ষের বিশেষ কোনো দাবি না থাকায় ধুমধাম ছাড়াই বিয়েটা সম্পন্ন হলো। ধুমধাম না হলেও এরই মধ্যে বিশ হাজার টাকা ধার করা হয়েছে। এবং খরচ হয়েছে। আমাদের পরিবারে কঠিন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো যা সামাল দেয়াটা ছিল খুবই দুঃসাধ্য।

এরই মধ্যে বড় ভাইটির এসএসসি পরীক্ষার ফরম ফিল আপ করতে হবে। কিন্তু টাকাও যোগাড় করা যাচ্ছে না। মেজভাইটি এইটে বৃত্তি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করায় কিছু টাকা পেলেন। সেই টাকা ও বাড়তি কিছু ধার করে বড় ভাইয়ের ফরম ফিল আপ করা হলো। ঘরে ফিরলেই চোখে পড়ে মায়ের পরা ছেড়া শাড়িটা। মায়ের দুটো সুতি শাড়ি। একটি ছিড়ে গেছে, অন্য শাড়িটাও তেমন নতুন নয়। কোনোখানে বেড়াতে গেলে একটি ভালো শাড়ি প্রয়োজন, তাও আজ নেই। মা ঘর থেকে কোথাও বের হয় না। কারণ পরনে যে তার ছেড়া শাড়ি। মায়ের কষ্ট দেখে আমার প্রায়ই কান্না আসতো। মনে মনে ভাবতাম, মাকে যদি একটা দামি শাড়ি কিনে দিতে পারতাম, মা কতো খুশি হতেন। কিন্তু আমাদের তিন ভাইয়ের পক্ষে কখনোই শাড়ি কিনে দেয়া সম্ভব ছিল না।

বড় ভাইটিকে অর্থের দিক চিন্তা করে কলেজে ভর্তি করা হলো না। মেজভাইটি পড়ালেখায় ভালো থাকায় তাকেই কষ্টের মধ্যে পড়ালেখার খরচের টাকা যোগাড় করে দিতেন বাবা। আমিও কাপড়ের পাইকারি দোকানে কাজ শিখতে গেলে গেলাম। ধার-দেনা পরিশোধ হতে লাগলো। আমাদের পরিবারে কিছুটা সচ্ছলতা ফিরে এলো। বোনটি স্বামীর সংসারে সুখী। বড় ভাইটি বন্ধুজন পরিষদে কর্মরত ও সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত। মেজভাইটি এমএ পাস করে একটি বেসরকারি কলেজে চাকরি নিয়েছেন। বাবা চাকরি থেকে অবসর নিয়ে এখন পেনশনে। এখন ঈদ এলেই আমরা তিন ভাই আমাদের মাকে তিনটি শাড়ি দিই। বাবাকে পাঞ্জাবি-পাজামা। আমাদের পোশাকের অভাব নেই। মায়ের হাতে যখন শাড়ির প্যাকেট তুলে দিই মা তখন খুশিতে কেদে ফেলেন। আমার মায়ের এখন কোনোখানে বেড়াতে যেতে অসুবিধা হয় না। পরতে হয় না ছেড়া শাড়ি। ঘরে ফিরে মায়ের হাসি ভরা মুখটি দেখলে আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আমাদের ঘরটা এখন একটা ছোট বেহেশত।

জিয়া মার্কেট, ভোলা থেকে

ভাস্বর

– এমএ সামাদ

ষাটের দশকের প্রায় শেষ ভাগের কথা। বিয়ের তিন চার মাস পরে নবপরিণীতাকে নিয়ে চট্টগ্রামের রিয়াজুদ্দিন বাজারে গেলাম শাড়ি কিনতে। আমার স্ত্রী কুমিল্লার মেয়ে এবং চট্টগ্রামের কোনো মার্কেটে এই তার প্রথম যাওয়া। যদিও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শাড়ি কেনা তবুও ঘুরে বেড়ানোরও ছিল একান্ত ইচ্ছা। তাই বেশ কয়টা দোকান দেখার পর একটা বোম্বাইওয়ালার দোকানে ঢুকলাম। সেলসম্যান বহু রকমের শাড়ি এনে হাজির করলো সামনে। এটা-সেটা দেখার পর আমার স্ত্রীর নজর কাড়লো সিনথেটিক জাতীয় নতুন ধরনের এক শাড়ি। আমি অবশ্য মনে মনে পছন্দ করেছিলাম ঝলমলে একটা

সুতি শাড়ি। বেশ কয়টা শাড়ি হাতানোর পর তার পছন্দ করা শাড়ির প্রতি ইঙ্গিত করে বললাম, শাড়ি কি ওটাই নেবে?

সে চুপিসারে বললো, তুমি কি এতো দামি শাড়িটা কিনবে আমার জন্য?

এখানে বলে রাখি, আমার গায়ের রঙ খুব ফর্শা। কিন্তু আমার স্ত্রী শ্যামাঙ্গিনী। তাই তার ধারণা, তাকে আমি পুরোপুরি পছন্দ করি না। যদিও আমার আচরণে কোনোদিনই তা প্রকাশ পায়নি। আমি সব সময়ই তাকে বলেছি যে, গায়ের রঙ-এর প্রতি আমার মোহ নেই, সুব্যবহার ও উন্নত মন-মানসিকতাই কাম্য।

সে যাক। *ধান ভানতে শিবের গীত* গেয়ে ফেললাম। তার কথা শুনেই চটজলদি শাড়িটা কিনে নিলাম। অপ্রত্যাশিত শাড়ির কার্টনটা হাতে পেয়ে সে আবেগে আপ্লুত, আনন্দে উদ্বেলিত। তার চোখে মুখে দেখতে পেলাম কি যে একটা খুশির আবহ। আর কিছু কিনবে কি না জিজ্ঞাসা করলে সে অনিচ্ছা প্রকাশ করে সোজা বাসায় ফেরার আবদার জানালো।

ঘরে পৌছেই কাপড় পাল্টে নতুন শাড়ি পরে আমার সামনে হাজির। পায়ে ধরে সালাম করে জিজ্ঞাসা করলো, কেমন লাগছে?

উত্তরে বললাম, অপূর্ব! কিন্তু তুমি তো বলেছিলে এ শাড়ি নিত্য পরার জন্য নয়, তবে এখনই যে পরে ফেলেছো?

তোমাকে দেখানোর জন্য। এ কথা বলেই সে আমার বুকে মাথা রাখলো।

তারপর অনেক দিন গড়িয়েছে। কালের পরিক্রমায় সে-ই এখন একটা শাড়ির দোকানের মালিক। ওটার চেয়ে অনেক দামি শাড়ি সে রোজই পরেছে, এখনো পরছে। কিন্তু সেদিনের নতুন শাড়ি পরা, তার আনন্দ উচ্ছ্বাস ভরা চেহারাটা আমার মনে ভাস্বর হয়ে আছে।

চট্টগ্রাম থেকে

অনীহা

– ঝর্না

১৯৯৪ সালের কথা। প্রথমবারের মতো মা হবো। তাই সম্ভাব্য তারিখের বেশ কিছুদিন আগেই আমার মায়ের কাছে চলে এলাম। যথাসময়ে মা হলাম। এবার শ্বশুরবাড়ি যাবার পালা। স্বামীর কর্মস্থল ঝিনাইদহে। ওনারও যাবার সময়। বললাম, আমার মা এবং শাশুড়িমায়ের জন্য দুটো শাড়ি কিনবো।

তাদের দুজনের বয়স বিবেচনা করে মোটামুটি দামি দেখে সুতি দুইটা টাঙ্গাইলের শাড়ি কিনলাম। আমার শাশুড়ির সঙ্গে আমার ননদের শাশুড়িও আমাকে নিতে এলেন। তিনি কখনো আমার মায়ের বাসায় আসেননি। ভাবলাম, শাড়ি দুটো ওনাদের দুজনকে দিয়ে দিই। যা ভাবলাম তাই করলাম। মনে মনে ঠিক করলাম, আমার মাকে পরে একটা কিনে দেবো।

যথারীতি শ্বশুরবাড়ি চলে এলাম। শাশুড়ি কথা প্রসঙ্গে শাড়ি সম্পর্কে দুই চার কথা শুনিয়ে দিলেন এবং সেটা যে কোনো শাড়ির পর্যায়ে পরে না এটা বলতেও ভুল করলেন না। দুঃখ পেলাম কিন্তু বলতে

পারলাম না যে, ওই শাড়ি আমার আব্বা কেনেননি। কিছুদিন পর দেখলাম নতুন শাড়ি ছিড়ে কাথা সেলাই করা হচ্ছে। কষ্ট পেলাম, কাদলাম।

ওনার শাড়ির অভাব নেই। এই শাড়িটা কাথা সেলাই না করে রেখে দিতে পারতেন। পয়সার দিক থেকে ছোট না হলেও মনের দিক থেকে ছোট ভাবতে বাধ্য হলাম। আমাদের দেশের মেয়েরা কতোকাল আর শাশুড়িদের এই মানসিক নির্যাতনের শিকার হবে?

এবার আসি অন্য ঘটনায়। স্বামীর কর্মস্থল ঝিনাইদহে থাকতাম। ভাড়া বাড়িতে থাকি। বাড়ির মালিকের স্ত্রীকে ভাবী বলে ডাকি। তিনি খুবই আন্তরিক। সব সময় খোজখবর রাখেন। ওনার বাসায় থাকা অবস্থায় আমার দ্বিতীয়বার মা হওয়ার পালা।

আমার শ্বশুরবাড়িতে শ্বশুর সাহেব অসুস্থ এবং আমার মায়ের বাসায় আমার মা অসুস্থ। আমি ঢাকায় এসে কোন বাসায় থাকবো, কে আমাকে এবং আমার বাচ্চাকে যত্ন করবে এতোসব নিয়ে যখন চিন্তায় অস্থির তখন ভাবলাম, ঢাকায় যাবার কি দরকার? এখানেই থাকি না কেন? ঘরে-বাইরে দুটো কাজের লোক রেখে দিলাম। হঠাৎ করে কেমন সাহসী হয়ে গেলাম।

১৯৯৬ সালের ১৫ রোজার সময় আমার সন্তান পৃথিবীতে এলো। ক্লিনিকে ভাবী আমার সঙ্গে গেলেন। আমার সেবা-যত্ন করলেন। বাসায় নিয়ে এসে দুই দিন রান্না করতে দিলেন না।

আমার এ দুঃসময়ে অনাত্মীয় এই মহিলাকে পরমাত্মীয় বলে মনে হলো। সামনেই ঈদ। স্বামী-স্ত্রী মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম ঈদ উপলক্ষে ভাবীকে একটা শাড়ি উপহার দেবো। মার্কেটে গিয়ে একই রকমের কিন্তু ভিন্ন রঙের দুটো শাড়ি কিনলাম। শাড়ি দুটো আমার খুব পছন্দ হলো। ভাবলাম, ভাবী আমার চেয়ে একটু বয়স্ক। তাই ওনাকে কমলাটা দেবো আমি লালটা নেবো।

সেই মোতাবেক লাল ব্লাউজ, লাল নেইল পলিশ ইত্যাদি ম্যাচিং করতে যা লাগে সবই কিনে ফেললাম। রাতে গিয়ে ভাবীকে শাড়িটা দিয়ে এলাম। নিজেকে খুব সুখী মনে হলো। ভাবলাম, আমার জন্য এতো করলেন, একটু হলেও ওনার জন্য কিছু করলাম।

সকাল বেলা চাপকল থেকে পানি নিতে আসা ওনার কাজের মেয়ে সঙ্গে দেখা। সে বললো, চাচি, রাতে খালার সঙ্গে সাহেব অনেক রাগারাগি করেছেন। বলেছেন, ওই শাড়ি তুমি রাখতে পারবে না। পুরনো একটা শাড়ি দিয়েছে।

প্রথমে মন খারাপ হলেও নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম এই ভেবে যে, ছোটমেয়ে কি শুনতে কি শুনেছে। তাদের একমাত্র কাজ হলো ঝগড়া লাগানো। ভাই সে রকম মানুষই নন।

এক সময় ভাবী শাড়ি নিয়ে হাজির। শাড়ি খুলে একটা দাগ দেখিয়ে বললেন, ভাবী, শাড়িটা পুরনো, এটা ফেরত দিয়ে অন্য একটা নিয়ে আসেন।

লজ্জা পেলাম। বললাম, আপনি তাহলে আমার লালটা নেন। আমি আপনারটা রেখে দিই।

কিন্তু তিনি বললেন, যে শাড়ি আমি রাখবো না সে শাড়ি আপনাকেও রাখতে দেবো না।

ওনাকে আমার সাধ্য মতো বোঝালাম। তাতে কোনো কাজ হলো না। ওনার এক কথা। শেষে নিরুপায় হয়ে শাড়ি বদলাতে গেলাম।

পরদিন ঈদ। সেই শাড়ি আর একটিও নেই। এছাড়া অন্য কোনো ভালো শাড়িও নেই। দোকানদার বললো, ভাবী, এগুলো ইনডিয়ান শাড়ি। চোরাই পথে এসেছে। মহিলারা অনেক ঝোপঝাড় পেরিয়ে

অবশেষে আমাদেরকে সাপ্লাই দেয়। একটু আধটু ময়লা থাকতেই পারে। আপনি বরং এ শাড়িটাই রেখে দেন।

কিছুই বললাম না। দীর্ঘশ্বাস গোপন করে পছন্দ না হওয়া সত্ত্বেও একটা শাড়ি নিয়ে বাসায় চলে এলাম। বাসায় এসে মন খারাপ করে রইলাম। বার বার চোখ মুছলাম। কিছুতেই শাড়িটাকে ভুলতে পারছিলাম না। লালটা না হোক, কমলাটা পেলেও মনের দুঃখ কিছুটা লাঘব হতো।

সেই শাড়ির শোক ভুলতে আমার অনেক দিন লেগেছে। বর্তমানে চলাফেরার অসুবিধার জন্য শাড়ি পরি না বললেই চলে। তবুও বাঙালি মেয়ে বলে যখন মাঝে মধ্যে আলমারি খুলে শাড়ি নেড়ে-চেড়ে দেখি, গুছিয়ে রাখি তখন সেই শাড়ি দুটোর কথা খুব মনে পড়ে। এবং মনটা ভারী হয়ে যায়।

এখন আর কাউকে শাড়ি উপহার দিতে ইচ্ছা করে না।

গোড়ান, ঢাকা থেকে

প্রস্তাব

ঘটনাটা বেশ আগের। আমাদের জনৈক আত্মীয়া আমেরিকা থেকে এসেছেন। সঙ্গে তাদের উঠতি বয়সের মেয়ে। আত্মীয়টি অনেক দিন পরে দেশে এসেছেন। উদ্দেশ্য ছুটি কাটানো। এ উপলক্ষে বেশ কিছুদিন থাকবেন। কন্যার সামারের ছুটি চলছে। দেশে বিভিন্ন নিকট আত্মীয়ের বাড়ি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেই সঙ্গে সব মার্কেটগুলোও চষে বেড়াচ্ছেন। তার দলটা সব সময় ভারী ভারী থাকছে। এখনকার ঢাকায় যেমন ইস্টার্ন প্লাজার মতো মার্কেট আছে তখন অতো বিপণি কেন্দ্র ছিল না।

আমরা তখনকার দিনের একটা অভিজাত মার্কেটে শপিং করতে যাই। আত্মীয়টি অনেক দিন বাইরে থাকার সুবাদে দেশি জিনিসের দর-দাম করা আমাদের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমরা একটা শাড়ির দোকানে ঢুকে পড়ি। উদ্দেশ্য আমাদের, বেশ কিছু শাড়ি কেনা। সে দোকানের সেলসম্যানরা ছিলেন আমাদের পূর্ব পরিচিত। ধরা যাক, দোকানটির নাম ছিল *শাড়িমেলা।* প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে দোকানিরা তাদের বাহারি টিউবলাইটের সুইচগুলো অন করে দিলেন। আমাদের পক্ষের কয়েকজন তাদের শাড়ি দেখাতে বলে। সেলসম্যানরা বিভিন্ন ধরনের বাহারি শাড়িগুলো আমাদের টেনে ধরে দেখাতে থাকেন। বর্তমান সময়ে যেমন বিভিন্ন বাহারি শাড়ি, বিশেষ করে হিন্দি সিনেমার নামের অনুসরণে দেখা যায়, তখন ছিল সিল্ক। জামদানি, বেনারসি, শিফন প্রভৃতি নামের শাড়ি। সেলসম্যানরা আমাদের শাড়ি দেখাচ্ছিলেন আর দাম করছিলেন আমাদের ছোটমামা। ছোটমামা দামগুলো খুব কমিয়ে বলছিলেন। কিন্তু সেটা সেলসম্যানদের মনঃপূত হচ্ছিল না। ছোটমামা ক্যাশে বসা ঝাকড়া চুলওয়ালা ছেলেটির দিকে বার বার ইশারা করছিলেন এবং তার প্রচ্ছন্ন সমর্থন চাইছিলেন।

ক্যাশে বসা সেই ইয়াং চ্যাপ মুচকি হেসে ছোটমামার কথায় সায় দিচ্ছিলেন।

কি আর করা! যুবক বললেন, প্যাক করে দাও।

সেদিন আমরা যুবকের স্যাকরিফাইসের তাৎপর্য বুঝতে পারিনি। আমরা বেশ কিছু শাড়ি কিনি। এবং সেগুলো বেশ শস্তা দামেই। পরদিন আমরা যখন সেই মার্কেটে সেই দোকানে যাই তখন ঘটে আসল

ঘটনাটা। দোকানের বয়স্ক সেলসম্যানই আসল ঘটনাটা পাড়লেন। তিনি আমাদের বড় খালাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মুরুব্বি, আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। তার বক্তব্য অনেকটা এ রকম :
মালিকের তিন ছেলে, মেয়ে নেই। এই শাড়ির দোকানে অনেক উঠতি বয়সের মেয়ে বাজার করতে আসে। আপনাদের বিদেশি আত্মীয়ার মেয়েটিকে মালিকের ছেলের পছন্দ হয়েছে। মালিক বলেছেন প্রস্তাবটা আপনাদের কাছে পাড়তে।

নাম ঠিকানাবিহীন

আলেয়া

– মাহমুদ আল–হাছান

নিজের অথবা পরিবারের যে কারো জন্য কাপড় কিনতে দোকানে গেলে কেনাকাটার ফাকে দোকানে রাখা দামি সুন্দর মনোরম শাড়িগুলো নিবিষ্ট চোখে চেয়ে দেখতাম আর মনে মনে সবচেয়ে সুন্দর শাড়িটি পছন্দ করে রাখতাম। আন্তরিক সিদ্ধান্ত নিতাম যে, যখন আমার ঘরে বৌ হয়ে সঞ্চি আসবে তখন তাকে অবশ্যই এ শাড়িটি কিনে দেবো। এভাবে আমার মনের আলনা এবং হৃদয়ের শোকেসে কতো রঙ ডিজাইনের শাড়ি যে কিনে জমা করেছি তার হিসাব নিজেও দিতে পারবো না। নিঝুম রাতে মায়াময় জ্যোৎস্নালোকে, একাকী ঘরে, স্নিগ্ধ কল্পলোকে সেই শাড়িগুলো এক একটা করে সঞ্চিকে পরাতাম। ঘোমটা টানা লাজুক বধূকে তন্ময় হয়ে দেখতাম এবং নির্ঘুম রাতে শিহরিত হতাম। কতোবার ভাবতাম যে, তখন যদি এ শাড়িগুলো পাওয়া না যায়!
একবার রংপুরে *মায়া শাড়ি ঘরে* একটা নীল শাড়ি এতো পছন্দ হয়ে গেল যে, জরুরি অনেক খরচ ছেড়ে শাড়িটাই কিনে ফেললাম। একবার ভাবলাম যে, সঞ্চির রেজাল্ট বের হলে তখন এই শাড়িটা উপহার দেবো। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলাম। এমনিতেই সঞ্চির পরিবারে আমার নাম শুনলেই কার্পেট বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। সেখানে যদি শোনে যে এ শাড়ি আমিই দিয়েছি তাহলে আণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা শতভাগ। অনেক ভেবে, শুভদিনের সুপ্রতীক্ষায় শাড়িটি সযত্নে শোকেসেই সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিলাম।
একদিন সকালে বাড়ি থেকে বের হবো। হঠাৎ আমার এক প্রতিবেশিনী আচম্বিতে এসে আমার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে করুণ কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকে অনেক কষ্টে টেনে তুললাম।
ঘটনা কি জানতে চাইলে তিনি বললেন, বাবা, আমার মেয়ে আলেয়া। সে তো তোমাদের বাড়িতেই ছোটবেলা থেকে কাজ করে খেয়ে–পড়ে মানুষ হয়েছে। পাড়াপ্রতিবেশী সবার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে মেয়েটাকে বিয়ে দিলাম গত বছর। জামাইকে দশ হাজার টাকা যৌতুক দেয়ার কথা ছিল। এখন মেয়েটাকে সে প্রতিদিন পশুর মতো অত্যাচার করে টাকার জন্য। কাপড়–চোপড় দেয় না। মেয়েটাকে এনে কয়েকদিন বাড়িতে রাখলাম। আজ নিতে এসেছে। এবার যদি অন্তত একটা শাড়ি মেয়েটাকে না দিই তাহলে আর অত্যাচারের সীমা রাখবে না। আমার মেয়েটার জীবন বাচাও বাবা!

সব শুনে খুব রাগ হলো আমার বললাম, আপনার জামাই কোথায়?
প্রতিবেশিনী বললেন, বাড়িতে।
বললাম, চলুন তো, তাকে বৌ করার সাধ মিটিয়ে দিয়ে আসি। ভরণ–পোষণ দিতে পারে না আবার বৌ পিটিয়ে পৌরুষ দেখায়, কাপুরুষ কোথাকার!
মহিলা আরো বেশি হাউমাউ করে উঠলেন। বললেন, বাবা, তাহলে তো আর রক্ষা নেই। এবার তাহলে নিশ্চিত ও মেয়েটাকে মেরে ফেলবে। তুমি তো সব সময় তাদের কাছে থাকবে না বাবা!
ভাবলাম, ঠিকই তো! কি সুন্দর সামাজিক এবং প্রকৃতিগত পক্ষপাতিত্ব জামাইদের জন্য। অসহ্য।
প্রতিবেশিনী আরো করুণ চোখে চেয়ে কাদতে লাগলেন। বুকে এক ধরনের শীতল স্পর্শ অনুভব করলাম। ইতিমধ্যে অনেকেই জড়ো হয়েছে। আত্মপ্রকাশের সুপ্ত ইচ্ছা ছিল কি না জানি না। বলে ফেললাম, ঠিক আছে, আপনি যান, আমি দেখছি।
কিন্তু কথাটা বলেই নিজের সীমাবদ্ধতা আচ করতে পারলাম। কমপক্ষে তিনশ টাকার কমে শাড়ি কেনা সম্ভব নয় এবং কোনোভাবেই সেদিন তিনশ টাকা সংগ্রহ করতে পারলাম না। তখন আমার পারিবারিক সামর্থও তেমন ছিল না। প্রতিবেশিনীর করুণ আর্তি আর নিজের মুখ রক্ষার সূক্ষ্ম স্বার্থে আমার স্বপ্ন মাখা, হৃদয়ের মাধুরী মেশানো, ভালোবাসার কল্পনাস্নাত ওই শাড়িটিই আলেয়াকে দিয়ে এলাম। শাড়ি পেয়ে আলেয়ার যে প্রসন্ন আলোকিত মুখচ্ছবি ফুটে উঠলো তার মূল্য শাড়ির দামে পরিমাপ অসম্ভব। মনে মনে বললাম, সঞ্চি, তোমাকে অপমান করলাম না, অসহায় মানবতার প্রয়োজনে প্রিয় বস্তু উৎসর্গ করে তোমাকে সম্মানিত করলাম। কারণ বস্তুটি তোমার।
আট দশ দিন পর খুব সকালবেলা বিছানায় থাকা অবস্থায়ই সেই প্রতিবেশিনীর বাড়িতে সমস্বরে বুকফাটা আর্তনাদ শুনতে পেলাম। দাত ব্রাশ করতে করতে এগিয়ে গেলাম সেই বাড়ির দিকে। গিয়ে যা শুনলাম তাতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। আলেয়া স্বামীর বাড়িতে তার ঘরের পাশে কাঠাল গাছে শাড়ি বেধে আত্মহত্যা করেছে।
মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ব্যাপারটা ভালো করে জানার জন্য বাইসাইকেল করে আলেয়ার স্বামীর বাড়ি চলে গেলাম।
অনেক মানুষ উঠানে। মাঝখানে আলেয়া নির্বিকারভাবে নিশ্চিন্তে মাটিতে শুয়ে আছে। পরনে তার সেই নীল শাড়িটি। আমার মনে হলো, আলেয়া আমাকে দেখে মিটিমিটি হাসছে আর বলছে, ভাইয়া, শুধু একটু স্নেহ–ভালোবাসা এবং অনুগ্রহের অপেক্ষায় ছিলাম। তোমার স্নেহসিক্ত এ শাড়িটি পরেই তাই বিদায় নিলাম এ বিচারহীন পৃথিবী থেকে।
এক অপরাধ বোধে পুড়তে লাগলাম। এ মৃত্যুর জন্য কে দায়ী? আমি, নাকি আমরা সবাই?

গোলমুণ্ডা, জলঢাকা, নীলফামারী থেকে

ঋণ

– দেলওয়ার আল–ইসলাম

অর্থ কষ্টই ছিল আমার পড়ালেখার প্রধান অন্তরায়। সব কষ্ট সহ্য করা যায়। কিন্তু এ কষ্ট কিছুতেই সহ্য হয় না। বিত্তশালীদের মাঝখানে বসবাস ছিল আমাদের বিত্তহীন এক পরিবারের। তখন মনে হতো *অর্থই জীবন, অর্থই সকল সুখের মূল।* আমাদের বাড়ির চারপাশের সবাই ছিল প্রবাসী। হয় ইংল্যান্ড, নয়তো আমেরিকা। আমার সঙ্গে সমবয়সীদের স্যানডাল থেকে শুরু করে মাথার টুপি পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসের সঙ্গে পার্থক্য ছিল সুস্পষ্ট। আমি ছিলাম আর্থিক দিক থেকে দুর্বল। আসলে আমার দীনতা এ পর্যন্তই। ভালো ছাত্র ও ভালো চরিত্রের জন্য স্কুলে, গ্রামে সবাই আলাদাভাবে দেখতো।

এভাবেই চলছিল জীবন। সহপাঠীরা যখন রঙ–বেরঙের ছাতা আর আধুনিক সব স্কুল ব্যাগ নিয়ে স্কুয়ে যেতো তখন আমি পলিব্যাগে বই নিয়ে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে স্কুলে যেতাম। কারণ ছাতা ও ব্যাগ এ দুই সম্ভ্রান্ত বস্তুর কোনোটিই আমার ছিল না। সকালে থাকতো মক্তব, তারপর স্কুল। বিকেলে সবাই যখন খেলার মাঠে বল নিয়ে তখন চুলো জ্বালানোর খড়কুটো খুজতে আমি ব্যস্ত থাকতাম। গ্রামের সব ছেলেরা যখন লণ্ঠন বাতির আলোয় পড়াশোনা করে জোরে, চিৎকার দিয়ে তখন আমি নীরবে বই খুলি মাটির প্রদীপ নিয়ে।

প্রাইমারি পেরিয়ে হাই স্কুলে গেলাম। প্রাইমারিতে বৃত্তি পেলাম হেড স্যারের বিশেষ তত্ত্বাবধানে ও মায়ের দারুণ উৎসাহে যা পাওয়ার সৌভাগ্য আর কারো হয়নি আমাদের স্কুলে। ক্লাস এইট পর্যন্ত বেতন মাফ হওয়ার জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম পড়াশোনা চালানোর অবলম্বন পেলাম। ক্লাস ফাইনালগুলোতে ভালো করার কারণে নাইন ও টেনের বেতনও মাফ করে দিল স্কুল।

সামনে এসএসসি পরীক্ষা। ফরম ফিল আপ করতে টাকা লাগবে। মাকে বললাম। মা বাবাকে বলার পর বাবা যা বললেন তার সারমর্ম হলো, পড়ালেখা করে ছেলে তো আর জজ–ব্যারিস্টার হবে না, অভাবের সংসারে অতো টাকা দেয়া অসম্ভব। স্কুলে যাওয়ার দরকার নেই। অতএব পড়াশোনা বন্ধ। আমার যেন দমও বন্ধ হয়ে যাবে। মা চুপিচুপি বললেন, চিন্তা করিস না, উপায় একটা হবেই।

কয়েকদিন পর মা টাকা দিলেন। বললাম, কোথায় পেলে?

প্রথমে বললেন না। অনেক পীড়াপীড়ির পর বলেন, বিয়ের সময় যে শাড়ি পেয়েছিলেন সেটি বিক্রি করেছেন।

নিজেকে অপরাধী ভেবে কাদতে লাগলাম। ভাবলাম, ষোল বছর ধরে সংসারের শত অভাবেও মা যে শাড়ি আগলে রেখেছিলেন, আমার জন্য তা বিক্রি করতে হলো।

চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, চোখের জল ফেলিস না, এর অনেক মূল্য। তোকে বড় হতে হবে, অনেক বড়।

আজো এই শব্দগুলো প্রতিধ্বনিত হয় অন্তরে।

এরপর আর কোনোদিন পেছনে তাকাইনি। এখন সমাজে আমি প্রতিষ্ঠিত। গ্রামে সুন্দর একটা বাড়ি করেছি। বাবা মাকে নিয়ে শহরে থাকি। তাদের দোয়ায় সুন্দরী বৌ ও সুখী সংসার পেয়েছি।

বিত্তশালীদের ভিড়ে বিস্মৃত প্রায় বাড়িখানা এখন আধুনিক অট্টালিকা। এই বাড়িতে যখন থাকি তখন মনে হয়, আমি এক ঋজু দেবদারু। চারপাশে ভিড় করছে আগাছা। কারণ আমার রঙিন ব্যাগ, ছাতাওয়ালা সহপাঠীরা বিদেশ পাড়ি জমায় পড়াশোনা শেষ না করেই।
আল্লাহর রহমতে এখন আমার অনেক টাকা পয়সা। মাকে প্রায়ই প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে অনেক শাড়ি দিই। ঈদে গরিব দুঃস্থদের মাঝে বহু শাড়ি বিতরণ করি। তবুও তৃপ্তি আসে না। মনে হয়, সেই শাড়ির ঋণ কখনো শোধ করতে পারবো না।

শাহজালাল উপশহর, সিলেট থেকে

অসমাপ্ত ভালোলাগা

– শকুন্তলা

সাত দিনের টুরে কক্সবাজার গিয়েছিলাম আমরা। দারুণ কেটেছে এই কয়েকটা দিন। ঢাকার যান্ত্রিক জীবন যাপনের মাঝে হঠাৎ এই হারিকেন টুরে কক্সবাজার আসায় মনে হয়েছিল যেন নিজেকে ফিরে পেয়েছি। যান্ত্রিক জীবন যাপনের মধ্যে থাকতে থাকতে যে যন্ত্র হয়ে যাইনি, এখানে আসার পর তা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু আজকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে ঢাকায়। ফেরার কথা মনে হতেই মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। একটু পরেই গাড়িতে উঠতে হবে আর তাই সবাই বিদায় জানাচ্ছে সবার কাছ থেকে। সবাই খুব মজা করছে। তবে আমার ঢাকায় ফিরতে ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে, সব কিছুই ফেলে যাচ্ছি এখানে। আমার কিছুই ভালো লাগছে না। কারণ আজকের পর তার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না বা সেই ধরনের সম্ভাবনাও নেই।
এ সাত দিনের চার দিনই আমল দিইনি তাকে। এতো ছেলের ভিড়ে তাকে আলাদা করে চেনা বা বোঝার সময় কিংবা সুযোগ হয়নি। কিন্তু পাচ দিনের মাথায় আবিষ্কার করলাম তাকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং অন্য রকমভাবে। খুব ভালো লাগলো তাকে। ভালোলাগাটা ভালোবাসায় রূপ নেয়ার আগেই বিদায় জানাতে হচ্ছে তাকে। আমার কিছুই করার নেই।
আপার ডাকে নিজের মধ্যে ফিরে এলাম। ছবি তোলার জন্য ডাকছেন। আমরা দু বোনই আজকে শাড়ি পরেছি। সে কেন পরেছে তা জানি না। তবে আমি পরেছি তার জন্য। আজকের শাড়ি পরা, সাজা সব কিছুই তার জন্য। জানি না কেমন লাগছে আমাকে। কারণ আমি দেখতে অতোটা সুন্দর না। তবে সবাই প্রশংসাই করছে আজকে।
জার্নিতে শাড়ি পরা এমনিই বিরক্তিকর। তার ওপর পরেছি জর্জেট। শাড়িটা ঠিক রাখতে পারছি না। বার বার খুলে পড়তে চাচ্ছে। তাও পরেছি নিজেকে সুন্দর করার জন্য।
গাড়িতে উঠে জানালার পাশে সিট নিয়ে বসে পড়লাম। আমার পাশে আপা বসলেন। একটু পর সবাই যে যার সিট নিয়ে বসে পড়লো। খুব খারাপ লাগার কারণে চোখ বন্ধ করেছিলাম। গাড়ি ছাড়ার পর চোখ খুললাম। আমার দুটো চোখ শুধু তাকেই খুজতে লাগলো। হঠাৎই আবিষ্কার করলাম তাকে আমার সোজাসুজি সামনের সিটে। খুব খুশি হলাম আর মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম আল্লাহকে।

ধীরে ধীরে রাত বাড়ছে। বাসের সবাই ঘুমিয়ে পড়ছে একে একে। কিন্তু আমার এই চোখে কোনো ঘুম নেই। আমার সামনের জনও হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে এতোক্ষণে।
আমার হাতটা ধীরে ধীরে তার সিটের ওপর রাখলাম আর মনে মনে প্রার্থনা করলাম সে যেন আমার হাতটাকে স্পর্শ করে। প্রার্থনা করতে করতে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।
গাড়ির ঝাকুনিতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতেই আমার শরীরে এবং মনে আশ্চর্য আনন্দ দেখা দিল। কারণ আমার হাত সে ধরেছে। খুব খুশি হলাম। কিন্তু পরক্ষণে মনে হলো, সে ইচ্ছাকৃতভাবেই আমার হাত ধরেছে। একটা ভালোলাগার অনুভূতিতে ছেয়ে গেল। কিন্তু কেউ যদি ওই অবস্থায় দেখে ফেলে তাহলে কি হবে ভাবতেই গা শিউরে উঠলো। হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলাম হাতটাকে ধরে। মনে হলো, কাজটা ঠিক হয়নি। ছিঃ, কি ভাববে সে আমাকে। নিজেকে খুব ছোট মনে হতে লাগলো। সে যদি আমাকে খারাপ ভাবে? নিজেকে বার বার তিরস্কার করলাম ঠিক হয়নি আমার কাজটা করা। তারপরও ভালো লাগছিল।
খুব দ্রুতই ঢাকায় পৌছালাম আমরা। দুজন দুদিকে চলে গেলাম। তারপর আর দেখা হয়নি তার সঙ্গে। তবে চেষ্টা করলেই পারতাম দেখা করতে। কিন্তু তা করিনি। কারণ জীবনে কিছু ভালোলাগার স্মৃতি থেকে যা সামান্য ছোয়াতেই মনের ক্যানভাসে দাগ পড়ে যায়। ইচ্ছা করলেও মোছা যায় না সেই স্মৃতি।
আজও শাড়ি পরতে গেলে মনে হয় তার কথা। কারণ জীবনে ওই একজন মানুষের কাছে সুন্দর হওয়ার জন্য, তাকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য শাড়ি পরেছিলাম যা আর কখনো করিনি।
সেদিন ছোটমা *বিচ্ছু* পত্রিকা নিয়ে আমার সামনে মেলে ধরলেন। একটা নামের ওপর তার দৃষ্টি। বললেন নামটা পড়ো।
আমি পড়লাম আহমেদ শুভ।
শুভ নামটা খচ করে বাধলো বুকের ভেতর। কে এই শুভ?
শুভ, তোমাকে বলছি, তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছো? আর যদি তুমি সেই শুভ হও তাহলে তোমার প্রতি শুভেচ্ছা রইলো।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, ঢাকা থেকে

পাশের বাড়ি

– মাহমুদ হাসান

সদ্য মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ করে ইউনিভার্সিটি থেকে বাড়িতে আসা। প্রায়ই ইউনিভার্সিটির স্মৃতি কল্পনা করে অবসর সময়গুলো অতিবাহিত করছি। মাঝে মধ্যে লক্ষ্য করি পাশের বাড়ির ভাবীর প্রয়োজন অপ্রয়োজনে আমাদের বাসায় যাতায়াত। হঠাৎ মাথায় দুষ্টু বুদ্ধির লুকোচুরি খেলা শুরু হয়ে গেল। ভাবীর স্বামী সরকারি কলেজের প্রফেসর। অন্য জেলায় তার পোস্টিং। সেই জন্য সপ্তাহে দুই তিন দিন সেখানে ক্লাস নেয় এবং সময় মতো বাসায় চলে আসে। দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে তাদের সংসার। ভাবীর আকর্ষণ তবু একটুও কমেনি। মন ভোলানো আকর্ষণীয় দেহ সৌষ্ঠব। যেন স্বপ্নপুরীর সেই রাজকন্যা।

ভাবীর যাতায়াত যেন আরো বেড়ে গেল আমাদের বাসায়। একদিন আমাদের বাসার সবাই বিকেলে পাশের খালার বাসায় আড্ডা দিচ্ছে। সেদিন ভাবী পেছনের দরজা দিয়ে আমাদের বাসায় আগের মতোই আবার এলেন। এসেই আমার সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় গল্প বলা শুরু করলেন। সাহস পাচ্ছিলাম না ভাবীকে পুরোপুরি বুঝে ওঠার।

হঠাৎ ভাবীর অঙ্গভঙ্গি আমার দেহের প্রতিটি শিরায় কাপনের সৃষ্টি করলো। সাহস করে ভাবীকে কাছে টেনে জড়িয়ে ঠোটে ঠোট রেখে দলিত করে ফেললাম আমার দেহের সঙ্গে। সেদিন ভাবী প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে আমাকে এর মজা দেখাবেন বলে বিদ্যুতের বেগে নিজ বাসায় চলে গেলেন।

ভাবলাম এখানেই সব শেষ। কিন্তু না। এ যে কেবল শুরু।

পরদিন আবার তিনি যাতায়াত শুরু করলেন। সেদিন ভাবীর কানে কানে বললাম, আপনার সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে।

ভাবী বললেন, এতো কিসের কথা বাবু? দরকার হলে রাতে এসো।

আমার সাহস আরো বেড়ে গেল। সেদিন ভাবীর স্বামী যথারীতি তার কর্মস্থলে। বাসায় শুধুই ভাবী এবং তার ছেলেমেয়ে। রাতের খাবার সেরে বাসা থেকে বেরিয়ে গেলাম। মাকে বলে গেলাম আজ বাসায় ফিরবো না, আমার বন্ধুর বাসায় থাকবো। অনেক দিন পর বাড়িতে আসা। তাই আমাকে কেউ বাধা দিলো না। রাত তখন এগারোটা। এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করে ভাবী যে খাটে ঘুমান ঠিক সেখানের জানালায় গিয়ে টোকা দিলাম। ভাবী তখন কেবল ঘুমের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। দুষ্টু ভাবী হয়তো বুঝতে পেরেছেন দুষ্টু দেবরের আগমন। ভাবী ভেবেচিন্তে দশ মিনিট পর পেছনের দরজা খুলে দিলেন। আমি একটুও দেরি না করে তার বাসার ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ইতিমধ্যে বাচ্চা দুটি ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন শুধু ভাবী আর আমি।

এতোক্ষণে চারদিকে রাতের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। অন্য একটি বেডরুমে গিয়ে ভাবী আর আমি পাশাপাশি বসলাম।

রুমে শুধু একটি মৃদু ডিমলাইট হালকা আভা ছড়াচ্ছে। ভাবী বললেন, কি এমন জরুরি কথা সোনা, তাড়াতাড়ি বলে ফেলো।

ভাবীকে বললাম, আজ আপনাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে এসেছি।

মুহূর্তের মধ্যে তিনি ভুলে গেলেন তার অন্য কেউ আছে। ভাবী আমাকে তার বুকের ওপর টেনে নিয়ে তার ঠোটে আমার ঠোট তলিয়ে দিলেন। তারপর একে একে আমার হাত ভাবীর শরীরের প্রতিটি অঙ্গে অবাধে বিচরণ করতে লাগলো। ভাবীর প্রতিটি অঙ্গও আমার সমস্ত আচরণের পূর্ণ সমর্থন দিয়ে গেল। তারপর একে একে সমস্ত বাসনা পূর্ণ করলাম।

সেদিন ভাবীর পরনের শাড়িটা উত্তেজনার মুহূর্তে কিছু অংশ ছিড়ে ফেলেছিলাম। ভাবী তখন দুষ্টুমি করেই বলেছিলেন, তোমাকে তো আমি সবই দিয়ে দিলাম। তুমি আমাকে কিছু দেবে না?

ভাবীর ভালোবাসায় তৃপ্ত হয়ে তাকে একটি শাড়ি উপহার দেয়ার কথা বললাম।

তিনি বললেন, সোনা, এখনো তো বেকার। টাকা পাবে কোথায়?

বললাম, ভাবী, যেদিন চাকরি পাবো তার প্রথম মাসের টাকায় আপনাকে একটি শাড়ি উপহার দেবো।

ভাবী বললেন, ঠিক আছে সোনা। সেদিনের অপেক্ষায়ই থাকলাম।

তারপর একদিন চাকরিও পেলাম। কিন্তু ভাবীকে শাড়ি দেয়া আমার এখনো হয়নি।

পূর্ণ ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক, কক্সবাজার থেকে

বৈষম্য

– অনামিকা

মলি, এই মলি, তোর শ্বশুর এসেছেন। ডাকলেন মেজচাচি। বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে বসলাম। এর আগে শ্বশুরের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তিনি আমাকে নিতে এসেছেন। শাড়ি পরে পরিপাটি হয়ে ওনার সামনে গেলাম। আমাকে দেখে শ্বশুরমশাই খুশি হতে পারলেন না। মুখের ওপর বলে দিলেন, তিনি শুনেছিলেন বৌ এর চেয়ে বেশি সুন্দরী। ওনার পোশাক, চেহারায় কার্পণ্যের দাগ স্পষ্ট। অনুষ্ঠান করে বৌ তুলে নিতে পারবেন না বলে নিজে নিতে এসেছেন। আমারও মন ভেঙে গেল যখন দেখলাম শ্বশুর আমার জন্য গহনা তো দূরে থাক, একটা শাড়ি পর্যন্ত আনেননি। বাড়িতে এই নিয়ে কানাঘুষা শুরু হয়ে গেল।

আব্বা মনে খুব কষ্ট পেলেন তার সবচেয়ে আদরের মেয়ের এই রকম শ্বশুর দেখে। মনকে সান্ত্বনা দিলাম এই ভেবে, শাড়ি–গহনার কি দরকার? একটা বিয়ে যে হয়েছে এই তো কতো। ছোটবেলা থেকে সাজগোজের ওপর ছিল আমার প্রবল ঝোক। আব্বাও কোনো জিনিস দিতে কোনোদিন কমতি করেননি। কলেজ যাওয়ার আগেও ঘণ্টাখানেক ধরে সাজগোজ করতাম। ছেলে বন্ধুও ছিল প্রচুর।

এদিক দিয়ে আমার ছোট বোন ছিল ঠিক আমার উল্টো। সে ছিল খুবই নরম স্বভাবের মেয়ে এবং কোনো রকম সাজগোজ করতো না। এরপর আব্বা যখন আমার বিয়ের কথা ভাবতে লাগলেন তখন দেখা গেল কোনো পাত্রপক্ষ আমাকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না। অন্যদিকে আমার ছোট বোনের জন্য ভূরি ভূরি বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগলো এবং আমার আগেই তার বিয়ে হয়ে গেল। বড় বোনের আগে ছোট বোনের বিয়ে হয়ে যাওয়া যে কতো বড় অপমানের তখন তা হাড়ে হাড়ে টের পেতে লাগলাম এবং উপলব্ধি করলাম ছেলেরা মেশার সময় সাজগোজওয়ালা মেয়ে বেশি পছন্দ করলেও বিয়ে করার সময় সাজগোজ বিহীন মেয়েই বেশি পছন্দ করে।

আমার সাজগোজ কমে গেল। কিন্তু থেমে গেল না। অবশেষে অনেক কষ্টে একটা ব্যাংকের জুনিয়র অফিসারের সঙ্গে আমার বিয়ে হলো। ছেলে শহরে চাকরি করলেও বাড়ি বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী একটা গ্রামে। যাই হোক। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার জন্য গোছগাছ করতে লাগলাম। আমার সঙ্গে যাবে আমার চাচাতো বোনের মেয়ে এবং ভাইয়ের মেয়ে। রওনা দেয়ার সময় কান্নায় আমার বুক ফেটে যেতে লাগলো। বাপের বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি সে জন্য না। আমার শ্বশুর প্রথমে আমাকে হাটিয়ে বাসস্ট্যান্ডে, পরে যাত্রীবাহী বাসে করে নিয়ে যাবেন শুনে। কার, সে তো অনেক দূরের কথা। বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত যাওয়ার জন্য ন্যূনতম একটা রিকশাও ঠিক করেননি। বললেন, বাসস্ট্যান্ড তো বেশি দূরে না, এটুকু হেটে যাওয়ায় ভালো।

আমাদের সবচেয়ে বড় চাচাতো বোনের বিয়ে হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। তখনো নাকি তাকে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কারে করে। আর নব্বই-এর দশকের বাড়ির সবচেয়ে আধুনিক মেয়ের শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার করুণ অবস্থা দেখে মা-চাচিরা কাদতে লাগলেন। আব্বা শোকে পাথর হয়ে গেলেন। অপমানে, লজ্জায় কাদতে কাদতে শেষ পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ি গিয়ে পৌছালাম।

একদিন পর শবেবরাত। শবেবরাতের দিন শ্বশুরমশাই-এর পেছনে শাশুড়ি মিন মিন করতে লাগলেন কিছু মাংস কিনে আনার জন্য। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কিন্তু মাংসের কোনো হদিস মিলছে না। পরে জানা গেল আমার শ্বশুর কম দামে ইনডিয়া থেকে ব্ল্যাকে মাংস আনতে দিয়েছেন, রাত বারোটার আগে এসে পৌছাবে না। কিছুদিন থাকার পর বাপের বাড়ি চলে আসার আগে শ্বশুরমশাই দয়াপরবশ হয়ে আমাকে একটি ব্ল্যাকে আনা ইনডিয়ান শাড়ি দিলেন। শাড়ি দেখে আমার মনে হচ্ছিল বিলাপ করে কাদি। এই শাড়ি পরে বাপের বাড়ি যাব কি করে?

বাড়ি ফেরার পথে বোনঝি-ভাইঝিকে বার বার হাত-পা ধরে বলতে লাগলাম তারা যেন বাড়িতে গিয়ে আমার শ্বশুরবাড়ির কাণ্ডকারখানা না বলে। বাড়িতে গিয়ে নেমে চিৎকার করে কাদতে লাগলাম। কেউ আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলো না। শুধু শাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকলো।

শাড়িটা বাড়ির কাজের মহিলাকে দিতে গেলে সে নিল না। বললো, এই রকম শাড়ি সে পরে না। আমার নতুন বিয়ে হয়েছে, আমার কাছ থেকে ভালো শাড়ি চায়। এই শাড়ি নিয়ে এখন আমি কোন জাহান্নামে যাবো? একবার মনে হলো পুড়িয়ে ফেলি। শাড়িটা হয়তো যত্ন করে তুলে রাখলে বা মাঝে মাঝে পরলে মহৎ কাজ হতো। কিন্তু না, আমি এতো মহৎ হতে পারলাম না। আবার পুড়িয়ে ফেলতেও পারলাম না। তাহলে কি করলাম? কাথা বানানোর সময় শাড়িটা কাথার ভেতরের অংশে দিয়ে কাথা সেলাই করে তুলে রাখলাম।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন
খুলনা থেকে